# দ্বিতীয় অধ্যায়

# ত্রৈলোক্যনাথের ছোটগল্পে হাস্যরস

## (১)

সাহিত্য সৃষ্টির পেছনে স্রষ্টার মনোজগৎ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই কোন স্রষ্টার সৃষ্টিকে পরিপূর্ণরূপে জানতে হলে আগে জানতে হবে স্রষ্টাকে এবং তাঁর সমাজ প্রতিবেশকে। কেননা একজন স্রষ্টার সৃষ্টিমানস অনেকটাই নির্ভর করে তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র এবং কোন পরিবেশের মধ্য দিয়ে তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন তার উপর। 'চন্ডীমঙ্গল'-এর কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে যে দুঃখবাদ তা তো তাঁর আত্মজীবনেরই প্রভাবজাত। আবার নজরুলের সাহিত্যে যে বিদ্রোহের ছটা তাও তাঁর আত্মজীবন এবং সমাজ প্রতিবেশেরই অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কবিজীবনী' প্রবন্ধে মহাকবি দান্তের উদাহরণ উল্লেখ করে বলেছেন :

> '' কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের কর্মে উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারে; কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। তাঁহাদের কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে। দান্তের কাব্যে দান্তের জীবন জড়িত হইয়া আছে। উভয়কে একত্র পাঠ করিলে জীবন এবং কাব্যের মর্যাদা বেশি করিয়া দেখা যায়।''[১]

কবি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন :

> ''কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্ত্তি—তাহা ত আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে, এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে।''[২]

সুতরাং একথা দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলা যায়, সাহিত্যিকদের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—একটিকে বাদ দিলে অপরটির স্বরূপ উন্মোচন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য আলোচনা করতে গেলে আগে তাঁর ব্যক্তিজীবন এবং সমাজ-মানসকে জানা প্রয়োজন।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুলাই (বাং ১২৫৪, ৬ই শ্রাবণ, বুধবার) ২৪ পরগণা জেলার শ্যামনগরের নিকটবর্তী রাহুতা গ্রামে এক কুলীন বংশে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়। ত্রৈলোক্যনাথেরা ছিলেন ছয় ভাই। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়। ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর আত্মীয়স্বজন থাকলেও তারা কাছাকাছি কেউ ছিলেন না। তারা ছিলেন বিভিন্ন প্রান্তে, কেউ রাণীগঞ্জ, কেউ পুরুলিয়ায়, কেউ বা বিহারে। ত্রৈলোক্যনাথ ছেলেবেলা থেকেই অন্য আর চার পাঁচজনের থেকে ব্যতিক্রমী স্বভাবের ছিলেন। অত্যন্ত দুরন্ত স্বভাবের ত্রৈলোক্যনাথের ভয়ে গ্রামে অনেকেই তটস্থ থাকতো। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে সে দুরন্তপনার পরিচয় লেখক দিয়েছেন :

> ''তাঁহার একটি প্রকান্ড দল ছিল। এই দলের সকলগুলিই এক এক ধনুর্ধর। দুষ্টামি করিতে তাহারা বিশেষ মজবুৎ ছিল। পরের বাগানের ফল পাড়িয়া খাইতে, লোককে মারিতে ধরিতে এই দল কিছুতেই ভীত হইত না।''[৩]

তবে লেখাপড়ায় ত্রৈলোক্যনাথ একজন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। যদিও তাঁকে খুব কষ্ট করে পড়াশুনা করতে হয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই দারিদ্র্য ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। গ্রামের পাঠশালায় তাঁর শিক্ষা জীবন আড়ম্ভ হয়। চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সের মধ্যে তাঁকে বারবার স্কুল পরিবর্তন করতে হয়। তিনি যখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন তখন ম্যালেরিয়ার মড়কে প্রথমে তাঁর পিতামহী, পরে মা ও বাবার মৃত্যু হয়। তিনি নিজেও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন যদিও ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। যা কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ভয়াবহ ঝড়ে তাও নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থায় বেঁচে থাকাই যখন প্রচন্ড কষ্টের ব্যাপার হয়ে পড়েছিল তখন পড়াশুনা চালানো তাঁর পক্ষে আর সম্ভবপর ছিল না। অতএব সেখানেই তাঁকে ছাত্রজীবন সমাপ্ত করতে হয়। রোগে-দুঃখে দারিদ্র্যে বিব্রত হয়ে ত্রৈলোক্যনাথ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়লেন। তখন ত্রৈলোক্যনাথের বয়স ছিল আঠারো বছর। এই সময় মানভূম পুরুলিয়ায় তাঁর এক আত্মীয় ছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ ভেবেছিলেন সেখানেই গিয়ে উঠবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথে গেলেন। ইতিমধ্যেই তাঁর সমস্ত পাথেয় শেষ হয়ে যায়। তখন গন্তব্যস্থলে পৌছানোর জন্য পদব্রজেই তিনি চললেন। পথে এক হিন্দুস্থানী চাপরাশীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। সে আসামের চা বাগানে কুলি চালানের কাজে নিযুক্ত ছিল। ত্রৈলোক্যনাথকে তিনি আসামের চা বাগানে ভালো চাকুরি পাইয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে চা বাগানের কুলি হিসেবে চালান দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের ভাগ্য ভালো যে শেষপর্যন্ত তাঁকে আসামে যেতে হয়নি। চাপরাশির রক্ষিতা এক বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের দয়ায় ত্রৈলোক্যনাথ সে যাত্রায় কুলিগিরি করার হাত

থেকে রক্ষা পান। এরপর অনেক কষ্টে বনজঙ্গল পাহাড় পেড়িয়ে তিনি পৌঁছালেন তাঁর সেই আত্মীয়ের বাড়িতে। পথে কয়েকদিন বন্যকুল খেয়েই তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছে।

মানভূমে আত্মীয়ের বাড়িতে কিছুদিন থাকার পর ত্রৈলোক্যনাথের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়ে সেই আত্মীয়টি তাঁকে স্কুলে ভর্তী করে দেন। সেখানে কিছুদিন পরেই প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে মেলা দেখার জন্য তাঁর রাঁচি যাওয়ার সুযোগ হয়। সঙ্গে ছিলেন মানভূমের ডেপুটি কমিশনার এবং আমলাবর্গ। মানভূম থেকে রাঁচি পাঁচদিনের পথ। পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল পেড়িয়ে সেখানে যেতে হয়। খুব অল্পদিনেই তিনি ছেলেদের ক্যাপ্টেন হয়ে গেলেন এবং তাদেরকে নানা দুঃসাহসিক কাজে উৎসাহিত করার চেষ্টা করলেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা ত্রৈলোক্যনাথ নিজেই বর্ণনা করেছেন :

> ‘‘জয়পুর নামক স্থানে বাঁদরের পালের মাঝ হইতে গাছে উঠিয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া, মার কোল হইতে ছানা কাড়িয়া লইলাম। ঝালিদা উপস্থিত হইয়া কাঁসাই নদীর মূল নির্দেশ করিবার নিমিত্ত বালকদিগকে দুর্গম গিরিপ্রদেশে লইয়া চলিলাম। সুবর্ণরেখার তীরে শিলি নামক স্থানে, গিরিগুহায় ভল্লুক কিরূপে থাকে তাহার অনুসন্ধান করিলাম।’’[৪]

যাইহোক যথা দিনে তিনি রাঁচি পৌঁছালেন। কিন্তু সদাচঞ্চল ত্রৈলোক্যনাথ অল্পসময়ের মধ্যেই রাঁচি পরিত্যাগ করলেন এবং বনের পথ অনুসরণ করলেন। পরের ঘটনা ত্রৈলোক্যনাথের নিজের ভাষাতেই বলা যেতে পারে :

> ‘‘ পথে যাইতে যাইতে দু’জন ঢাকাই মুসলমানের সহিত সাক্ষাৎ হয়। নাগপুর অঞ্চলের বন্য প্রদেশে তাহারা হাতি ধরিতে যাইতেছিল। আমি তাহাদের সঙ্গে জুটিলাম। কিছুদিন পর জঙ্গলের মাঝে একদিন তাহারা আমার গায়ের কাপড় কাড়িয়া লইল। পুনরায় রাঁচি আসিলাম। রাঁচি হইতে আবার মানভূমে আসিলাম। বর্ধমানের নিকট গদা নামক স্থানে রেফাকষুসেন নামক একজন মৌলবী তখন মানভূমে থাকিতেন। তাঁহার নিকট পার্শী শিক্ষা করিলাম।’’[৫]

কিছুদিন পরে তিনি নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন। এরপর ছাত্রজীবন বলতে যা বোঝায় সেই জীবনে আর ফিরে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। যদিও শিক্ষাগ্রহণের প্রক্রিয়ায় তিনি নিজেকে যুক্ত রেখেছেন আজীবন।

বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের পর আরম্ভ হয় তাঁর কর্মজীবনের অধ্যায়। বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন বাড়ির অবস্থা দুর্বিসহ, আহার নেই। তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে চাকরীর চেষ্টা শুরু করতে হয়। এই সময় ইছাপুর স্কুলে পন্ডিতের পদে অস্থায়ীভাবে তাঁর একটি কাজ জোটে। কিছুদিন

পরে সে কাজ চলেও যায়। এরপর তিনি বর্ধমানে এক আত্মীয়ের কাছে যান—এই আত্মীয়টি ছিলেন শিক্ষা বিভাগের একজন সরকারী পরিদর্শক। তাঁর সুপারিশ নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ বহু জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন, কিন্তু কোথাও তাঁর চাকরী জুটল না। এদিকে হাতে একটি পয়সাও নেই; অনাহার তাঁর নিত্য সঙ্গী। এই সময় লোকের বাড়িতে অতিথি হয়ে পথ চলতেন তিনি। সে সময় ১৮৬৬ সালে দেশে ঘোর দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়েছে। চারিদিকে ঘোর অন্নকষ্ট। সুতরাং কোনদিন আহার মিলত কোনদিন মিলত না। সন্ধ্যাবেলা কারও বাড়িতে গেলে যদি সে তাড়িয়ে দিত, তাহলে সারারাত অনাহারে গাছতলাতেও থাকতে হত তাঁকে। এরকম একদিনের বর্ণনা করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ :

> ''সন্ধ্যাবেলা আমি মেমারি আসিয়া পঁহুছিলাম। মেমারি ষ্টেশনের পুষ্করিণীর সান-বাঁধা ঘাটে পড়িয়া রইলাম; ভাবিতে লাগিলাম, দু'দিন আহার হয় নাই; অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি; যদি আজ রাত্রেও অনাহারে এখানে শুইয়া থাকি, তো কালপ্রাতে আরও দুর্বল হইয়া পড়িব, সুতরাং এখনি পথ চলা ভালো, রাত্রিতেই পথ চলিতে লাগিলাম। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পা আর উঠে না। একটা তেঁতুল গাছ হইতে তেঁতুল পাতা পাড়িয়া লইলাম। তাহাই চিবাইতে চিবাইতে পরদিন বেলা বারোটার সময় মগরায় আসিলাম।''[৬]

যাইহোক কিছুদিন পরে বীরভুম জেলার দ্বারকা নামক স্থানে স্কুলমাষ্টারির চাকরী পেলেন। কিছুদিন সেখানে চাকরি করার পর তিনি রাণীগঞ্জের উখড়ায় বদলি হলেন। মাইনে আঠারো টাকা। এইসময় দেশে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। সাধারণ লোকের দুরবস্থা তখন চরমে। কান পাতলেই শোনা যায় মানুষের অসহায় কাতর ক্রন্দন। দেশ এবং দেশের মানুষের এই দুরবস্থা ত্রৈলোক্যনাথকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এই অবস্থায় নিজে একবেলা হবিষ্যান্ন অন্যবেলা পেটভরে জল খেয়ে জীবনধারণ করতে লাগলেন। এভাবে জীবন ধারণ করে যে অর্থ তিনি বাঁচাতে পারতেন তা দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সহায়তায় দান করতেন। তিনি তাঁর তখনকার মনোভাব লিখেছেন :

> '' সেই সময় হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে যাহাতে এই স্বর্ণভূমি ভারতভূমিতে দুর্ভিক্ষ হইতে না পারে, এইরূপ কাজে আমি আমার মনকে নিয়োজিত করিব। সেদিন হইতে এই সম্বন্ধে যাহা কিছু শিখিবার আবশ্যক শিখিতে লাগিলাম। তখন মনে মনে এই স্থির হইয়াছে যে, ভারতের লোক যদি নিজে নিজে একটু যত্ন করে, তাহা হইলে এই দেশের অন্তত অর্ধেক দুঃখও দূর হইতে পারে। আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চক্ষু উন্মীলিত করিতে যত্ন পাইতেছি। কিন্তু কি করিব, সকলেই নিজের স্বার্থের জন্য ব্যস্ত। যাহাতে দেশের দুঃখমোচন হয়, এরূপ চিন্তা অল্প লোকেই করিয়া থাকেন; বড় জোর না

হয়, ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে কতকগুলি লোককে বৎসরের মধ্যে একদিন কি দুইদিন আহার দিয়া থাকেন। কিন্তু গরীব-দুঃখী লোকেরা চিরকালের জন্য যাহাতে এক মুঠা অন্ন পায়, এরূপ কার্য্যে কয়জনের দৃষ্টি আছে।''[৭]

এই জীবনদর্শন ত্রৈলোক্যনাথের সমগ্র জীবন ও সাহিত্যের ভিত্তিভভূমি হিসেবে কাজ করেছে।

এরপর বেশিদিন তিনি উখড়ায় ছিলেন না। ইতিপূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর সাহাজাদপুরের জমিদারিতে মাসে পঁচিশ টাকা বেতনে স্কুল মাষ্টারির চাকরীর আহ্বান এলে তিনি তা গ্রহণ করেন। অবশ্য খুব বেশিদিন সে চাকরি টেকেনি। সাহাজাদপুরে বাসকালে ত্রৈলোক্যনাথের জীবনে অনেকগুলি রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছিল। একদিন তিনি বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে নৌকা করে যাচ্ছিলেন, সেই সময় নদীর তীরে মাটির ঢিবির উপর তিনটি অশীতিপর বৃদ্ধাকে দেখতে পেয়ে তাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিজের বাসায় নিয়ে আসেন এবং সেবাযত্ন করেন। এ ঘটনা নিয়ে সেখানকার নায়েব মশায়ের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়েছিল। এর কিছুদিন পরে পূজোর ছুটি কাটিয়ে যখন তিনি বাড়ি থেকে সাজাদপুরে ফিরছিলেন তখন পদ্মার চরে কুমীরের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং ভাগ্য জোরে বেঁচে যান। এরপরের ঘটনা আরও বিস্ময়কর। পদ্মানদীতে দুরন্ত ঝড়ে তাঁর নৌকা উল্টে যায়। কোন প্রকারে সাতরে তিনি নদীর পাড়ে এসে ওঠেন কিন্তু অজ্ঞান হয়ে পরেন। তখন একজন চন্ডাল তাকে সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন এবং বাড়ি নিয়ে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করে তোলেন।

এরপর তাঁর এক আত্মীয়ের চেষ্টায় ওড়িশায় পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর পদে চাকরী হয় তাঁর। এই সময় প্লীহা জ্বরে আক্রান্ত হন তিনি। পরে আরোগ্য লাভ করার পর থানার দারোগা পদে চাকরী পান তিনি। দারোগাগিরির সূত্রে তাঁকে ওড়িশার জাজপুর, ওলাবয়, কেঁদারাপাড়া প্রভৃতি স্থানে ঘুরে বেড়াতে হত। এই সময় তিনি চলনসই গোছের ওড়িয়া ভাষা শিখে ফেলেছিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে 'উৎকল শুভঙ্করী' নামে একখানা মাসিক পত্রিকাও সম্পাদনা করতে শুরু করেছিলেন। কটকে থাকাকালীন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও গঙ্গাচরণ সরকারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই সময়ে তাঁর সঙ্গে একদিন পরিচয় ঘটে Sir William Hunter-এর। William Hunter ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হন। ভারতীয় ভাষার শব্দ রোমান হরফে লিপ্যান্তর করবার প্রণালী যা 'Hunter System of Transliteration' নামে পরিচিত তা উদ্ভাবন করেন তিনি। Hunter-এর সস্নেহ আনুকূল্যে কলকাতার একটি অফিসে ১২৫ টাকা মাসিক বেতনে চাকরী জোটে তাঁর। এই পদে কাজ করতে করতে অনেক ভালো ভালো লোকের সঙ্গে

তাঁর পরিচয় হয়। এই সময় বিভিন্ন দিক থেকে একের পর এক চাকরির প্রস্তাব তাঁর কাছে আসে। একদিকে ইংলিসম্যান পত্রিকার অফিসে ভালো পদ লাভের সম্ভাবনা অন্যদিকে হান্টার সাহেবের ইচ্ছায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্তির প্রস্তাব তিনি পান। কিন্তু দুটোর কোনটিকেই তিনি গ্রহণ করলেন না। এই সময়েই আবার ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কৃষি বাণিজ্য অফিস স্থাপিত হয়। ত্রৈলোক্যনাথ লিখেছেন : ''পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে দরিদ্রের দুঃখমোচনে সমর্থ হইব, এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য আশা ছাড়িয়া এখানে হেডক্লার্কের পদ গ্রহণ করি।''[৮] স্যার এডওয়ার্ড বক্ ছিলেন এই অফিসের প্রধান। বক্ সাহেবের আনুকূল্যে খুব অল্পদিনের মধ্যেই নানা জনহিতকর কার্যে নিজেকে যুক্ত করেছেন তিনি। এ সময় ভারতীয় হস্তশিল্পজাত কারুকার্যময় দ্রব্যাদির প্রচারের জন্য এবং এ বিষয়ে বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করেছেন তিনি। তাঁর চেষ্টাতেই ভারতের দেশীয় কুটিরশিল্প প্রথম বিদেশের বাজারে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠালাভের পথ খুঁজে পায়। অর্ধেন্দু বিশ্বাস তাঁর 'বাংলা উপন্যাসে তির্যক দৃষ্টি' গ্রন্থে জানিয়েছেন : ''বর্তমানে ভারতের বড় বড় শহরে ও ষ্টেশনে যে সব শিল্পদ্রব্যের বিপণি দেখা যায়, মূলত ত্রৈলোক্যনাথই সে সবের পথপ্রদর্শক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।''[৯]

আসলে ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক। তাই কীভাবে লোকের দুর্দশা মোচন হয় সর্বদাই সে চেষ্টা করে গেছেন তিনি। ১৮৭৭-১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সে সময় গাজোরের চাষ করে দেশবাসীর ক্ষুধা নিবারণের নতুন সম্ভাবনার কথা প্রথম তাঁর মাথাতেই আসে। ভারতের সর্বত্র যাতে শিল্পকার্যের উন্নতি হয় তা নিয়েও তিনি ভাবিত ছিলেন। ভারতের রপ্তানীযোগ্য কাঁচামাল এবং ভারতে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যের পরিচয় বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে 'A Rough List of Indian Art Manufactures' নামে একটি বই লেখেন তিনি। অচিরেই বইটি ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচারিত হয় এবং সেখানকার লোকেরা ভারতীয় শিল্পদ্রব্য সম্পর্কে আগ্রহী হন। ফলে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা উপার্জনের সুযোগ তৈরী হয়।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিলেতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জার্তিক শিল্প প্রদর্শনীতে ত্রৈলোক্যনাথ দেশের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হন। যদিও এই বিলেতযাত্রা নিয়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের তীব্র আপত্তি ছিল। কেননা ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান। ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে সমুদ্রযাত্রা তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা মেনে নিতে পারেনি। ঠিক এ কারণেই এর আগে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে হল্যান্ডের আমষ্টার্ডাম শহরে অনুষ্ঠিত শিল্প মেলায় যোগদানের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অনুরোধ এলেও আত্মীয়স্বজনের বাঁধায় সেখানে তিনি যেতে পারেননি। সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কে

এদেশীয়দের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা তাই পরবর্তীকালে সাহিত্য রচনার সময় ত্রৈলোক্যনাথের বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়েছিল। 'লুল্লু' গল্পে সমুদ্র যাত্রা সম্পর্কে লুল্লু আমীরকে বলে :

> ''আমরা ভারতীয় ভূত, ভারতের বাইরে আমরা যাইতে পারি না। সমুদ্রের অপর পারে পদক্ষেপ করিলে আমরা জাতিভ্রষ্ট হইব। আমাদের ধর্ম কিঞ্চিৎ কাঁচা। যেরূপ অপক্ক মৃত্তিকাভান্ড জলস্পর্শে গলিয়া যায়, সেইরূপ সমুদ্রপারের বায়ু লাগিলেই আমাদের ধর্ম ফুস করিয়া গলিয়া যায়, তাহার আর চিহ্নমাত্র থাকে না। ধর্মের গন্ধটি পর্যন্ত আমাদের গায়ে লাগিয়া থাকে না।''[১০]

যাইহোক এবারে কিন্তু দেশের উন্নতির কথা ভেবে সংস্কারের এই বন্ধনটিকেও তিনি ছিন্ন করলেন এবং বিদেশে পাড়ি দিলেন। প্রায় দশমাস সেখানে অবস্থানকালে তিনি মহারাণী সহ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নজরে আসেন। এ যাত্রায় তিনি ইংলন্ডের সাথে স্কটল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, ইটালি প্রভৃতি দেশে ভ্রমন করেন। এরপরে আবার তাঁর ইংলন্ডে যাওয়ার সুযোগ ঘটে। তাঁর 'Visit to Europe` গ্রন্থে এসব ভ্রমণবৃত্তান্তের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়।

বিলেত থেকে ফিরে এসে কলকাতায় ভারতীয় যাদুঘরে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 'Assistant Curator in Charge of Bengal Economic and Art Museum Collections' হিসেবে চাকুরী করেন। প্রায় দশবছর তিনি এই পদে কর্মরত ছিলেন। এইপদে থাকাকালীন তিনি বিভিন্ন জনহিতকর কার্যাবলীতে উদ্যোগী হন এবং জনগণের কল্যাণে কলম ধরেন। এই সময় তিনি 'Art Manufactures of India` নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এরপর তিনি ক্রমশঃ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর (১৭ই কার্তিক, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ) ৭৩ বৎসর বয়সে পুরীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

অবসর গ্রহণের পর ত্রৈলোক্যনাথ প্রায় ২৩ বছর জীবিত ছিলেন। এই সময় ত্রৈলোক্যনাথ নিজেকে পুরোপুরি সাহিত্য সাধনায় মগ্ন করেন। মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির সচেতন প্রয়াস সেখানে হয়তো ছিল না কিন্তু দেশ ও জাতির হিতসাধনের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি সাহিত্য সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর সম্বল ছিল সারাজীবন ধরে সঞ্চয় করা অসাধারণ জীবন অভিজ্ঞতা। গভীর জীবন জিজ্ঞাসা, জ্ঞাননিষ্ঠা ও বিদ্যাচর্চার সমন্বয়ে যে সাহিত্য জগৎ তিনি নির্মাণ করেছিলেন যে কোন সাহিত্যিকের পক্ষে তা যথেষ্ট ঈর্ষণীয়।

## (২)

বাংলাদেশের এক যুগসন্ধিক্ষণে ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পী ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল। সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম ও সংস্কৃতিগত দিক থেকে এই যুগটিকে নবজাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণ রূপে চিহ্নিত করা যায়। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতবাসীর কাছে এই যুগ ছিল নবযুগের বার্তাবহ। পুরানো জীবনের খোলস ছেড়ে এ যুগ বাঙ্গালীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল নবীন ও স্বতন্ত্র পথের পথিক হতে। এ সময় ধীরে ধীরে স্কুল কলেজের সংখ্যা বাড়ছে। সেখানে সাধারণ ভারতবাসী পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল ভাবতরঙ্গ দীর্ঘ দিনের ঝিমিয়ে পড়া বাঙ্গালীর মানসজগতে তীব্রগতির সঞ্চার করেছিল। এই সময় মানুষের মধ্যে দেখা দিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, যা পুরোপুরি পাশ্চাত্য সভ্যতার দান। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবল প্রতিক্রিয়ায় দীর্ঘকাল ধরে সযত্নে চর্চিত ধর্মীয় গোড়ামির শক্ত ভীতে ফাটল দেখা দিল। এরই সূত্রে মানুষের মধ্যে দেখা দিল তিনটি দল— নব্যপন্থী, প্রাচীনপন্থী ও সমন্বয়পন্থী। নব্যপন্থীরা চাইল প্রাচীন জীবনচর্চার সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করে যা কিছু নতুন তাকেই গ্রহণ করতে। প্রাচীনপন্থীরা গোঁড়ামিকে আকড়ে ধরতে চাইল এবং সমন্বয়বাদীরা প্রাচীন ও নবীন এই দুই ভাবধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে এগিয়ে চলতে চাইলেন :

> ''এরা ধর্মীয় জীবনে ভারতীয় জীবনধর্ম ও পাশ্চাত্য মানবধর্ম—এ দুইয়ের সমন্বয়ে নব পরিবর্তনের সূচনা করলেন। ভারতীয় জীবনধর্মের চিরন্তন অথচ সমকালোচিত সংস্কারকে এরা শ্রদ্ধা এবং পাশ্চাত্য মানবধর্মের বিশ্বজনীন এবং ভারতীয় জীবনসাধনার ক্ষেত্রে সহায়ক ও অগ্রসরমান সংস্কারগুলিকে স্বাগত জানালো। মূলতঃ বাঙ্গালী মনের সামগ্রিক পরিবর্তনের পটভূমিকায় এদের প্রচেষ্টা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।''[১১]

ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন এই সমন্বয়বাদীদের দলে। কেননা প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থীদের দোষ-ত্রুটিগুলি তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নবীন সম্প্রদায়ের অমিতাচার ও স্বেচ্ছাচারিতা, তাঁদের সামাজিক দূর্নীতির পরিপোষণ এবং অন্ধভাবে ইংরেজ সভ্যতার অনুকরণ। তাদের দেশ হিতৈষণার বাহ্যাড়ম্বর ও অন্তঃসারশূন্যতাকে তিনি কোনভাবেই মেনে নিতে পারেননি। কেননা তিনি ভালোভাবেই বুঝেছিলেন পরিবর্তন এবং তার মধ্য দিয়ে অগ্রসরই হল জগতের নিয়ম। ১৮৮৮ সালে খ্রীষ্টাব্দের ২৪ শে নভেম্বর ব্যাঙ্গালোর শহরে 'Change and Progress` বিষয়ে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে তাঁর এই মানসিকতা খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। তিনি স্বপ্ন দেখতেন ভারতবাসী একদিন তার সমস্ত জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্য, কূপমন্ডুকতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, অজ্ঞতা ও অলসতা কাটিয়ে উঠে নতুন ভারত নির্মাণ করবে। তাই তিনি প্রাচীন ও নবীন কোন আদর্শকেই গ্রহণ না করে উভয়

আদর্শের ভালো ভালো দিকগুলিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে এক নতুন আদর্শের মধ্য দিয়ে নিজেকে পরিচালিত করলেন। তাঁর এই নতুন আদর্শ হল সমন্বয়বাদের আদর্শ, যার মূলকথা হল মানবকল্যাণ ধর্ম। 'বাঙলা উপন্যাসে তির্যক দৃষ্টি' গ্রন্থে অর্ধেন্দু বিশ্বাস এ সম্পর্কে বলেছেন :

> ''আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর এই মানবকল্যাণ ধর্মের পিছনে কোন দল ছিল না, তাঁর অন্য কোন সহায়কও ছিল না, সম্পূর্ণ এককভাবেই তিনি তাঁর এই মানবকল্যাণ ধর্মের সাধনা করে গিয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মনীষীবৃন্দের মধ্যে এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য।''[১২]

ত্রৈলোক্যনাথ যে মানবকল্যাণ ধর্ম অন্তরে বহন করে চলেছিলেন অথবা যে মানবকল্যানকে ভিত্তি করে তাঁর একটি নিজস্ব জীবনদর্শন গড়ে উঠেছিল সেই মানবকল্যাণ ধর্মই তাঁর সাহিত্যের ভিত্তিভূমি রচনা করেছে। বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতার সাহায্যে তিনি মানুষের পাশবিকতা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যা তাকে ব্যথিত করেছিল। তাই মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য মোচনের জন্য আজীবন তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। সেই সঙ্গে সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার-অন্যায়-অবিচার কূপমন্ডুকতাকে ধিক্কারবাণে জর্জরিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে :

> ''তিনি জানিতেন মানুষ বড়ই হৃদয়হীন, বড়ই নৃশংস। ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা ছাড়া আর-কিছু বড় তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না। পৃথিবী যে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইতে পারে না তাহা তিনি জানিতেন। তবে মানুষ আর-একটু যদি হৃদয়বান্ হয়, আর-একটু পরার্থপর হয়, আর একটু বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হয় তবে সংসারের দু-একটি কন্টক উৎপাটিত হইয়া স্থানটা আর-একটু ভদ্ররকম ও বাসোপযোগী হয়। ইহাই তো যথেষ্ট।''[১৩]

এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি সাহিত্য সৃষ্টিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সাহিত্য অবসর বিনোদনের মাধ্যম ছিল না। জীবনসাধনার অঙ্গ হিসেবেই তিনি সাহিত্যকে গ্রহণ করেছিলেন। মানুষের নানা অনাচার, অবিচার অসংগতি ও নির্মমতার বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করার তীব্র অভিপ্রায় নিয়ে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এরফলে তাঁর সাহিত্যসাধনা সোজা ও সরল পথে পরিচালিত হয়নি। তাঁকে হতে হয়েছিল বাকা পথের পথিক। যার মূল অবলম্বন ছিল ব্যঙ্গ। এই ব্যঙ্গপ্রবণতাই ছিল তাঁর সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন। ত্রৈলোক্যনাথের এই ব্যঙ্গপ্রবণতা সম্পর্কে সমালোচক সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্যের তাই সহজ মূল্যায়ণ :

> ''প্রথম থেকেই তাঁর পন্থা সুনির্দিষ্ট। তিনি শিল্পী নন, প্রাণচেতনার তাগিদে শিল্প সংগ্রাহক। তাই সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি সরল পথের পথিক নন। তিনি উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্য রচনায় নেমেছেন। তাই তাঁর গতি বক্র। তিনি চোখ ফোটাতে চান, অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই তাঁর শিল্প সৃষ্টি ব্যাহত হয়েছে, কারণ তিনি শিল্পস্রষ্টা হতে চাননি।''[১৪]

আসলে যুগটাই ছিল ব্যঙ্গ রচনার অনুকূল। সবসময় সবরকম যুগ পরিবেশে ব্যঙ্গ সাহিত্যের উদ্ভব হয় না। একধরণের সংশয়বোধ, মানসিক দ্বিধা, চিন্তার দোদুল্যমানতা ব্যঙ্গ সাহিত্যের জন্ম দিয়ে থাকে। শিশিরকুমার দাশ তো যথার্থই বলেছেন :

> ''সমাজে যখন ভাঙন আরম্ভ হয়, যখন স্থির অবিচলিত সত্যগুলি পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে যেতে থাকে তখনই ব্যঙ্গের সূচনা।''[১৫]

যতক্ষণ পর্যন্ত প্রচলিত মূল্যবোধগুলি অস্তিত্বজ্ঞাপক প্রশ্ন চিহ্নের সামনে এসে না দাঁড়ায় ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যঙ্গ সাহিত্যের জন্ম হওয়া সম্ভব নয়। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর আগের বাংলা সাহিত্যে ছোটখাটো রস-রসিকতা থাকলেও কোনটিই যথার্থ ব্যঙ্গ সাহিত্য হয়ে উঠতে পারেনি, অথচ প্রতিভার তো অভাব ছিল না। আসলে ইংরেজ আমলের আগে ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে বহু ভাঙ্গাগড়া চললেও এমন কোন মূল্যবোধের জন্ম হয়নি যা প্রচলিত মূল্যবোধকে অস্বীকরণের বিপ্লবাত্মক আলোড়ণ গড়ে তুলতে পারে। সত্যিকথা বলতে ইংরেজের আগমন সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলল। যা ভারতবর্ষের ইতিহাসে অতীতে কখনো হয়নি। পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির স্পর্শ অন্ধকারে নিমজ্জিত ভারতবাসীর মনে জ্বালিয়ে দিল জ্ঞানের প্রদীপ শিখা। চক্ষুস্মাণ হল বাঙ্গালী। বহুকাল ধরে সযত্নে লালিত সংস্কারের অসাড়তা তখন আর তাদের কাছে দুর্বোধ্য রইল না। বাঙ্গালী লেখকদের অন্তরে জন্ম দিল একধরণের প্রতিবাদী সত্তা। এই প্রতিবাদী সত্তাই লেখকদের ব্যঙ্গ রচনা সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করল। এর ফলশ্রুতিতেই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রথম দিকে বিশেষ করে উনিশ শতকে শ্লেষ-ব্যঙ্গপ্রবণ রচনার প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। ভবাণীচরন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস'(১৮২৩), 'নববিবি বিলাস' (১৮৩০), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'(১৮৫৮), 'মদ খাওয়া বড় দায়', 'জাত থাকার কি উপায়'(১৮৫৯), মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা'(১৮৬০), 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'(১৮৬০), দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'(১৮৬৬),'জামাই বারিক'(১৮৭২),'বিয়ে পাগলা বুড়ো'(১৮৬৬), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'(১৮৬২) ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ট রঙ্গব্যঙ্গমূলক হাস্যরসাত্মক গ্রন্থগুলি তো এই সময়েরই সৃষ্টি। এই সময়ে অবির্ভূত হয়ে ত্রৈলোক্যনাথের রচনা স্বভাবতই ব্যঙ্গের দিকে ঝুঁকেছিল।

## (৩)

ত্রৈলোক্যনাথের মোট ছোটগল্প সংকলন চারটি—'ভূত ও মানুষ'(১৮৯৬), 'মুক্তামালা'(১৯০১), 'মজার গল্প'(১৯০৬), 'ডমরুচরিত'(১৯২৩)। এই চারটি গল্পগ্রন্থে মোট ২৪টি গল্প আছে। 'ভূত ও মানুষ' গল্পগ্রন্থটি ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম গল্প সংকলন। এতে মোট চারটি গল্প আছে—'বাঙ্গাল নিধিরাম'(অগ্রহায়ণ, ১৩০০), 'লুল্লু'(পৌষ১২৯৮), 'বীরবালা' (পৌষ, ১২৯৯) এবং 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' (শ্রাবণ, ১৩০২)। এই গল্পগুলি প্রত্যেকটি 'জন্মভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এরপরে প্রকাশিত হয় 'মুক্তামালা'। মোট এগারোটি গল্প এই গল্পগ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গল্পগুলি হল 'আদুরী ও আরসী', 'ভূতের বাড়ী', 'পুরাতন কূপ' 'শম্ভুঘোষের কন্যা', 'ললিত ও লাবণ্য', 'মূল্যবান তামাক ও জ্ঞানবান সর্প', 'সে কালের মোহর', 'ভয়ানক আংটি', 'কেন এত নিদয় হইলে', 'বেতাল ষড়বিংশতি' এবং 'মদন ঘোষের বদনে হাসি'। এই গল্পগুলি সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর প্রকাশিত 'মজার গল্প'(১৯০৬) গল্পগ্রন্থ মোট আটটি গল্পের সমষ্টি। এই আটটি গল্প হল - 'সোনাকরা জাদুকরের গল্প', 'ভানুমতী ও রুস্তম', 'জাপানের উপকথা', 'পূজার ভূত', 'পিঠে পার্ব্বণে চীনে ভূত', 'বিদ্যাধরীর অরুচী', 'মেঘের কোলে ঝিকিমিকি সতী হাসে ফিকিফিকি'এবং 'একঠেঙো ছকু'। এই গল্পগুলিও সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার পৃষ্টায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। ত্রৈলোক্যনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পসংকলন 'ডমরুচরিত' (১৯২৩) প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পরে। এতে সাতটি গল্প আছে। এই সাতটি গল্প আবার অনেকগুলি গল্পের সমষ্টি। এই গল্পগুলি হল :

'ঠিক কন্দর্প পুরুষ কি', 'গাছে ঝোলা সাধু', 'চিত্রগুপ্তের গলায় দড়ি-মোটা দড়ি নয়', 'ডমরুধরের তপস্যা', 'ছাল-ছাড়ান বাঘ', 'ডমরুধরের গলায় কফ' (প্রথম গল্প), 'একশত মোহর', 'সুন্দরবনের অদ্ভুত জীব', 'মশার মাংস', 'শূন্যপথে লোহার সিন্দুক', 'সন্ন্যাসীর কালীঠাকুর', 'চুম্বকের সার', 'কুম্ভীর বিভ্রাট' (দ্বিতীয় গল্প); 'নন্দীর ক্রোধ', 'টাকে ঠোকর', 'ঘরে গৌতম বাহিরে গৌতম', 'কার্তিকের কাঁধে বাঘ', 'ছোটখাটো ভালমানুষ ভূত', 'এলোকেশীর রূপমাধুরী', 'মা তুমি কে?', 'অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে বহ্বারম্ভে লগুক্রিয়া' (তৃতীয় গল্প); 'ডমরুধরের শব-সাধনা', 'ডমরুধরের সিদ্ধিলাভ', 'পিং মহাশয়', 'জিলেট জিলেকি সিলমেল', 'ধাঙ্গরের ঘরে কন্দর্প পুরুষ', 'ডমরুধরের মেমের পোষাক', 'এলোকেশীর মুড়ো খেঙরা', 'অমৃত কুন্ডের জল', (চতুর্থ গল্প); 'স্বদেশী কোম্পানী', 'ভিক্ষু ডাক্তার', 'চঞ্চলার গাই গরু', (পঞ্চম গল্প), 'সাহেবের কাজ', 'নারিকেলের বোরা', 'বলাই চিন্তির বিবরণ', 'মেনি ও ভিলে', 'ডমরুধরের হীরকলাভ', 'ডমরুধরের বুকে প্যাঁচ', 'ডমরুধরের নূতন

বুদ্ধি'(ষষ্ঠ গল্প); 'জিলেট মন্ত্র', 'ঢাকমহাশয়', 'মোল্লা জামাতা', 'সন্দেশের হাঁড়ী', 'উড়ুখ খু হাঁড়ী', 'আরব্য উপন্যাসের জিন', 'আবার এলোকেশী' (সপ্তম গল্প)।

এছাড়া 'রূপসী হিরন্ময়ী' ও 'আমার সেই অমূল্য মণি' নামে দুটি গল্প 'জন্মভূমি' পত্রিকায় যথাক্রমে ১৩০০ ও ১৩০৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পদুটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'বাঙ্গাল নিধিরাম' গল্পের উপসংহার হিসেবে ত্রৈলোক্যনাথ 'রূপসী ও হিরন্ময়ী' গল্পটি লিখেছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথের চারটি গল্পসংকলনের গল্পগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণীবিন্যাস করা যেতে পারে :

| | | |
|---|---|---|
| (ক) ভূতের গল্প | : | ভূতের বাড়ী, কেন এত নিদয় হইলে (মুক্তামালা), পূজার ভূত, পিঠে পার্বণে চীনে ভূত (মজার গল্প)। |
| (খ) অলৌকিকতা প্রধান গল্প | : | বীরবালা (ভূত ও মানুষ), ভয়ানক আংটি, বেতাল ষড়বিংশতি (মুক্তামালা), মেঘের কোলে ঝিকিমিকি সতী হাসে ফিকিফিকি (মজার গল্প)। |
| (গ) সাধারণ গল্প | : | বাঙ্গাল নিধিরাম (ভূত ও মানুষ), 'আদুরী ও আরসী', 'পুরাতন কূপ, শম্ভুঘোষের কন্যা, ললিত ও লাবণ্য, সেকালের মোহর, মদন ঘোষের বদনে হাসি (মুক্তামালা), সোনাকরা জাদুগরের গল্প' (মজার গল্প)। |
| (ঘ) কৌতুক ও ব্যঙ্গ গল্প | : | লুল্লু, নয়নচাঁদের ব্যবসা (ভূত ও মানুষ), মূল্যবান তামাক ও জ্ঞানবান সর্প (মুক্তামালা), বিদ্যাধরের অরুচী, একঠোঙ্গা ছকু (মজার গল্প)। |
| (ঙ) রূপকথাধর্মী গল্প | : | ভানুমতী ও রুস্তম, জাপানের উপকথা (মজার গল্প)। |

সমাজ ও মানুষ—এই দুই ছিল ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের মূল লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ নির্মাণ করে নিয়েছিলেন একটি অনুবিশ্ব যা ভারতীয় ঐতিহ্যগতভাবে সম্পূর্ণ অভিনব না হলেও প্রচলিত সাহিত্য প্রবণতার নিরিখে অভিনবই বটে। লোককথা থেকে উপকরণ আহরণ করে গ্রামীণ বিশ্বাসের যে সন্দর্ভ বয়ন করেছেন লেখক, তাতে একই আধারে বাস্তব পরাবাস্তব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে তাঁর গল্পে। মূলত মানুষের কথা হলেও মানুষই সেই অনুবিশ্বের একমাত্র চরিত্র নয়। ব্যঙ, মশা, হাতী, ভূত-প্রেত, রাক্ষস-ক্ষোক্কশ প্রভৃতিও তাৎপর্যপূর্ণভাবে চরিত্রের মর্যাদা পেয়েছে। বস্তুত একাধিক পরিচিত লোক আখ্যানের ছায়ায় নির্মিত হয়েছে ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের জগৎ। তবে তিনি যেভাবে ও যে ভঙ্গীতেই বলুন না কেন, যতই আবরণ থাকুক না কেন, আমাদের ভুললে চলবে না যে সমস্ত আবরণের শেষে অবস্থান করছে সমাজ এবং মানুষই। হিন্দুধর্মের নানা কুসংস্কার, যেমন বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহপ্রথা—এগুলি তখনও সমাজ থেকে পুরোপুরি বিদায় নেয়নি। এদের চিরকালের মত বিদায় দিতে ত্রৈলোক্যনাথ যেন সরব হলেন। সমকালীন রাজনীতি, ভন্ড স্বদেশীয়ানা, মানবিকতার অবক্ষয়, উপনিবেশিক শক্তির প্রচন্ড চোখরাঙানী ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার তীব্র প্রয়াস সমগ্র জাতির মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। ত্রৈলোক্যনাথ সমাজের এই সেন্টিমেন্টকেই তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে।

ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম রচনা ‘কঙ্কাবতী’ (১৮৯২)। নামে এটি উপন্যাস (উপকথার উপন্যাস) হলেও গল্প হিসেবেই এটি বেশী সার্থক। অবশ্য ত্রৈলোক্যনাথের কোন রচনাই সেভাবে উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি। আসলে ত্রৈলোক্যনাথের প্রায় সমস্ত রচনাই টানা গল্পের ফ্রেমে বাঁধানো ছোট ছোট গল্পের সমষ্টি। ‘কঙ্কাবতী’ও অনেকটা সে রকমের। তবে উপন্যাস কিম্বা ছোটগল্প ‘কঙ্কাবতী’কে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন ত্রৈলোক্যনাথের রচনাবলীর মধ্যে ‘কঙ্কাবতীর’ গুরুত্ব সর্বাধিক। কেননা ত্রৈলোক্যনাথের মানসিকতা ও জীবনদর্শনের অনেকটাই ধরা পড়েছে ‘কঙ্কাবতী’তে। খেতু ও কঙ্কাবতী নামে দুই নরনারীর প্রেমের একটি ক্ষুদ্র আলেখ্য এর মধ্যে থাকলেও সমাজের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রোথিত নানা কুসংস্কার, সমাজের অন্তর্গত মানুষের স্বার্থপরতা, হৃদয়হীনতা ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করাই ত্রৈলোক্যনাথের মূল লক্ষ্য এখানে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী ও বাঙ্গালী সমাজের একটি দর্পণ হয়ে উঠেছে গ্রন্থটি। ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গের দর্পণে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সমাজজীবনের সহমরণ প্রথা, নারী শিক্ষার প্রতি তীব্র অনীহা, মানুষের অর্থবান হওয়ার সুযোগে সমাজের হতদরিদ্র মানুষের প্রতি নিপীড়নের নানা চিত্র যেমন উঠে এসেছে তেমনি উঠে এসেছে সামান্যতম ইংরজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মাতৃভাষাকে ভুলে গিয়ে ইংরেজবাবু হয়ে ওঠার জন্য

বাঙ্গালীর হাস্যকর প্রচেষ্টা। কোট প্যান্টপরা ব্যঙ ও কঙ্কাবতীর কথোপকথনে সেই হাস্যকর প্রচেষ্টাকেই ব্যঙ্গ করা হয়েছে এখানে। যেমন :

'' কঙ্কবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—''ব্যঙ মহাশয়! গ্রাম কোন দিকে? কোন্ দিক্ দিয়া যাইলে লোকালয়ে পৌঁছিব?''

ব্যাঙ উত্তর করিলেন,—''হিট্ মিট্ ফ্যাট।''

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'' ব্যাঙ মহাশয়! আপনি কি বলিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ভাল করিয়া বলুন। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—

কোন দিক্ দিয়া যাইলে গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইতে পারা যায়?''

ব্যাঙ বলিলেন,—''হিশ্ ফিশ্ ড্যাম।''

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'' ব্যাঙ মহাশয়! আমি দেখিতেছি,—আপনি ইংরেজী কথা কহিতেছেন।

আমি ইংরেজী পড়ি নাই, আপনি কি বলিতেছেন,

তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, অনুগ্রহ করিয়া যদি বাঙ্গালা করিয়া বলেন, তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারি।''

ব্যাঙ এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, কেহ কোথাও নাই। কারণ, লোকে যদি শুনে যে, তিনি বাঙ্গালা কথা কহিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার জাতি যাইবে, সকলে তাঁহাকে ''নেটিভ'' মনে করিবে। যখন দেখিলেন, —কেহ কোথাও নাই, তখন বাঙ্গালা কথা বলিতে তাঁহার সাহস হইল।

কঙ্কাবতীর দিকে কোপদৃষ্টিতে চাহিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধভাবে ব্যাঙ বলিলেন—''কোথাকার ছুঁড়ি রে তুই! আ গেল যা! দেখিতেছিস আমি সাহেব! তবু বলে, ব্যাঙ মশাই, ব্যাঙ মশাই! কেন? সাহেব বলিলে তোর কি হয়?''

কঙ্কাবতী বলিলেন,—''ব্যাঙ সাহেব! আমার অপরাধ হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা করুন। এক্ষণে গ্রামে যাইব কোন্ দিক দিয়া, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলিয়া দিন''

এই কথা শুনিয়া ব্যাঙ আরও জ্বলিয়া উঠলেন, আরও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, —''মোলো যা! এ হতভাগা ছুঁড়ির রকম দেখ! মানা করিলেও শুনে না। কথা গ্রাহ্য হয় না। কেবল বলিবে ব্যাঙ, ব্যাঙ! কেন আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে কি মুখে ব্যথা হয় না কি? আমার নাম মিষ্টার গামিশ।''

কঙ্কাবতী বলিলেন,—''মহাশয়! আমার অপরাধ হইয়াছে। না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। এক্ষণে, মিষ্টার গামিশ! আমি লোকালয়ে যাইব কোন্

দিক্ দিয়া, তাহা আমাকে বলিয়া দিন্। আমার নাম কঙ্কাবতী। বড় বিপদে আমি পড়িয়াছি। প্রাণের পতিকে আমি হারাইয়াছি। পতির চিকিৎসার নিমিত্ত আমি গ্রাম অনুসন্ধান করিতেছি। রতিমাত্র বিলম্ব আর করিতে পারি না। এই হতভাগিনীর প্রতি দয়া করিয়া বলিয়া দিন্—কোন্ দিক্ দিয়া আমি গ্রামে যাই!''

কঙ্কাবতী তাঁহাকে 'সাহেব' বলিলেন, কঙ্কাবতী তাহাকে মিষ্টার গামিশ বলিয়া ডাকিলেন, সে জন্য ব্যাঙের শরীর শীতল হইল, রাগ একেবারে পরিয়া গেল।... ''[১৬ক]

—এভাবে ত্রৈলোক্যনাথ কখনো ব্যাঙের রূপকে, কখনো মশার রূপকে, কখনো বাঘের রূপকে আবার কখনো বা ভূতের রূপকে ভারতবাসীর নানা অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ করেছেন। ত্রৈলোক্যনাথ সব থেকে বেশী আক্রমণ করেছেন হিন্দু সমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীকে। কীভাবে মানুষ তাঁর জন্মগত ব্রাহ্মণত্বের অধিকারে অপরকে শোষন করত, কীভাবে মানুষ সে একই অধিকারে নিজেদের সমাজের হোতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তুলত এবং সমাজবিধিও তারা তৈরী করত নিজেদেরই শাসনযন্ত্র হিসেবে সে সত্য ত্রৈলোক্যনাথ অত্যন্ত হাস্যকরভাবে এখানে তুলে ধরেছেন। সামগ্রিকভাবে ত্রৈলোক্যনাথের লেখক স্বভাবের অনেকটাই ধড়া পরেছে কঙ্কাবতীতে। এ গ্রন্থে ত্রৈলোক্যনাথের যে জীবনদর্শন প্রতিফলিত হতে দেখা যায় তা ত্রৈলোক্যনাথের অন্যান্য গ্রন্থেও অনুসৃত হয়েছে। শুধু জীবনদর্শনই নয় গল্পের আঙ্গিকে রূপকথার জগৎ ও রূপকের যে ব্যবহার তিনি এখানে করেছেন তা ত্রৈলোক্যনাথের প্রায় সব গল্পেরই বৈশিষ্ট্য। তাই 'কঙ্কাবতী'কে ত্রৈলোক্যনাথের প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা বলা যেতে পারে।

'ভূত ও মানুষ' গল্পের প্রথম গল্প 'বাঙ্গাল নিধিরাম'। এই গল্পে নিধিরাম দেবশর্মা নামে এক মহাকুলিন সৎচরিত্রবান ব্যক্তিকে সামনে রেখে সমাজের কিছু বাস্তব সমস্যাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখক। নিধিরাম দেবশর্মা এই গল্পের প্রধান চরিত্র। খুব স্বচ্ছলভাবে না হলেও নিঃসন্তান নিধিরাম তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ভালোই ছিলেন। কিন্তু ৪৫ বৎসর বয়সে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তিনি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর এই দুঃসময়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এককড়ি মহাশয় নিধিরামকে সেবা-শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলেন। অবশ্য একটি গোপন ইচ্ছাও এককড়ির মনে কাজ করেছিল। এককড়ি মহাশয় একদিন নিধিরামকে তাঁর অবিবাহিত কন্যা হিরন্ময়ীকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। হিরন্ময়ী যথেষ্ট সুন্দরী ছিল। কিন্তু নিধিরাম এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। কিন্তু কন্যাদায়গ্রস্থ এককড়ির একান্ত অনুরোধ ও হিরন্ময়ীর প্রবল ইচ্ছায় এ বিবাহ করতে তিনি রাজী হয়ে যান। কিন্তু সমস্যা বাঁধালেন বৈদ্যনাথ দেবশর্মা। তিনি অনেক ধনী এবং সেই সূত্রে গ্রামের কর্তাও। এর আগে তাঁর পুত্র গবিরুদ্দিন হিরন্ময়ীকে বিবাহ করতে চেয়ে ব্যর্থ হন। এখন তিনি কৌশলে মিথ্যা অভিযোগ এনে এককড়িকে জেলখানাতে পুরে দিলেন। এই দুর্দিনে এককড়িকে

সাহায্য করার জন্য নিধিরাম দেশে গিয়ে তাঁর সমুদয় সম্পত্তি বিক্রি করলেন। সম্পত্তি বিক্রি করার টাকা নিয়ে, যারপরনাই কষ্ট সহ্য করে, নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে, কিছুটা ভাগ্যেরও সহায়তায় এককড়িকে তিনি কারাগার থেকে মুক্ত করেন। কিন্তু বিপদের এখানেই শেষ নয়। একদিন বৈদ্যনাথ দেবশর্মার লোকজনের হাত থেকে হিরন্ময়ীকে উদ্ধার করতে গিয়ে তিনি প্রচন্ডরূপে আহত হলেন। ইতিমধ্যেই হিরন্ময়ীর সঙ্গে পরিচয় হয় ধনবান কুলীনের ছেলে নবীনের। একদিকে দরিদ্র অর্ধবৃদ্ধ, এক চক্ষুহীন, নাসিকাহীন, দন্তহীন, কিম্ভুতাকার নিধিরাম, অন্যদিকে ধনসম্পত্তি বিশিষ্ট, নবযৌবন সম্পন্ন রূপবান নবীনের মুখ—এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে পড়ে শেষেরটাকেই বেছে নিলেন হিরন্ময়ী। নবীনের পিতামাতা এতে সম্মত হলেও বেকে বসলেন এককড়ি। যাইহোক নিধিরাম একদিন সকল ঘটনা জানতে পারলেন। মনে মনে প্রচন্ড দুঃখ পেলেও নবীন ও হিরন্ময়ীর বিবাহের ব্যবস্থা করে দিলেন। বিবাহ সম্পন্ন হল। বিবাহের পরদিন নবীন নিজ স্ত্রী হিরন্ময়ীকে নিয়ে নিজ গ্রামে গমন করবার উদ্দেশ্যে নৌকা ভাড়া করলেন। তাদেরকে বিদায় করবার জন্য এককড়ি ও নিধিরাম গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। নৌকা ছেড়ে দিল। নিধিরাম মনে মনে প্রচন্ড কষ্ট পেলেন এবং অপ্রকৃতিস্থ হলেন। নিধিরামের অপ্রকৃতিস্থ হওয়ার দৃশ্য দেখে হিরন্ময়ী নবীনকে বলে : ''বাঙ্গাল কি করিতেছে। ঠাট করিয়া আবার বাবার কোলে শোয়া হইয়াছে।'' এর কিছুক্ষণ পরেই নিধিরামের প্রাণ বিয়োগ হয়।

'বাঙ্গাল নিধিরাম' গল্পে কৌলীন্যপ্রথা, অন্ধকুসংস্কার কীভাবে সমাজের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা একটি সরস কাহিনির মধ্য দিয়ে বিবৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে মানুষের নীতিবোধের অবক্ষয়ের একটি চিত্রকে উপস্থাপন করেছেন হিরন্ময়ী চরিত্রের মধ্য দিয়ে। বলতে দ্বিধা নেই হিরন্ময়ী চরিত্রের নীতিবোধের এই অবক্ষয় আমাদের সুস্থ মানবিকতাবোধকে আঘাত করে। এ কথা ঠিক ভারতবর্ষের কুসংস্কারের নিগড়ে বন্দী নারী জাতির প্রতি ত্রৈলোক্যনাথের সমবেদনার অভাব ছিল না। তাঁর বিভিন্ন রচনায় নারী জাতির সেই বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সহমর্মিতার সঙ্গেই তুলে ধরেছেন তিনি। কিন্তু যেখানে নারী জাতির মধ্যে মানবিকতার অবক্ষয় তিনি দেখেছেন সেখানেই নারীকেও কটাক্ষ করতে তিনি পিছপা হননি।

'ভূত ও মানুষ' গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'বীরবালা'। এই গল্পের কাহিনির দুটি অংশ—একটি বাস্তব অংশ ও অন্যটি স্বপ্নাংশ। গল্পের নায়ক দেবী সিংহ জাতিতে রাজপুত; নিবাস অযোধ্যায়। সংসারে বৃদ্ধ পিতামহী ছাড়া আর তার কেউ নেই। মাত্র এগারো বৎসর বয়সে বীরবালা নামে পাঁচ বৎসরের একটি বালিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। যদিও শুভদৃষ্টির পর বীরবালার সঙ্গে তাঁর আর সাক্ষাৎ হয়নি। দীর্ঘদিন পরে দেবীসিংহের শ্বশুর সপরিবারে অযোধ্যায় আসার পথে সরযুর ঘাটে এসে পৌঁছানোর খবর পেয়ে পিতামহীর আদেশে দেবী সিংহ তাদেরকে

নিয়ে আসার জন্য সরযূর ঘাটে গিয়ে  উপস্থিত হন। তাদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে রাত হয়ে যায়, তবু তারা আসেন না। তখন সরযূর কূল জনমানব শূন্য নীরব। দেবী সিংহ একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে বসে অপেক্ষা করতে থাকে। হঠাৎই একটি হনুমান তাকে আক্রমণ করে এবং সে জ্ঞান হারায়। এইটুকুই কাহিনির বাস্তব অংশ। এরপর দেবীসিংহ অজ্ঞান অবস্থাতেই স্বপ্ন দেখে। কাহিনির বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে স্বপ্নের বিস্তার। তিনি স্বপ্ন দেখলেন নিজেকে কেন্দ্র করেই। স্বপ্নে তিনি দেখলেন যে তিনি দেবী সিংহ নন, তিনি ধর্ম দত্ত। তার পিতা ভারত সিংহ। ভারত সিংহ সন্ন্যাসী অমাবস্যা বাবাজীকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। ভারত সিংহের ঘরে অমাবস্যা বাবাজীই সর্বেসর্বা। এদিকে অমাবস্যা বাবাজী ধর্ম দত্তকে একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। ইতিমধ্যে ভারতসিংহের একটি কন্যা হলে সেই কন্যাকে সন্ন্যাসী নিজে হত্যা করে দোষ চাপান ধর্ম দত্তের উপর। ধর্ম দত্তের জেল হয়। নিজ পুত্রের এই দুরবস্থার সময়ও ভারত সিংহ প্রচন্ড নির্বিকার থাকেন। ধর্ম দত্তের এই দুরবস্থায় তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে তাঁর শ্বশুর বাড়ির লোকজন এবং স্বয়ং বীরবালা। এরপর বীরবালা সক্রিয় হয়ে নানা অলৌকিক কার্য সমাধা করে প্রমাণ করে ভারত সিংহের কন্যার মৃত্যু হয়নি। এরপর ধর্মদত্তের মুক্তি ও বাবাজীর পলায়ন এবং বীরবালার সঙ্গে মিলনের মধ্য দিয়ে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে।

গল্পটিতে সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি ভারতবাসীর অন্ধভক্তির প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। ভারতবাসীর এই অন্ধ-সন্ন্যাসী প্রীতিকেই কটাক্ষ করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ অমাবস্যা বাবাজীর প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত করে।

‘ভূত ও মানুষ’ গল্পের পরবর্তী গল্প ‘লুল্লু’। ত্রৈলোক্যনাথের রচনাবলীর মধ্যে ‘কঙ্কাবতী’কে বাদ দিলে ‘লুল্লু’ গল্পটিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলা যেতে পারে। ডমরুচরিতের কথা মনে রেখেও একথা বলা যায়। ‘লুল্লু’ গল্পটিকে ত্রৈলোক্যনাথ অনেকটাই রূপকাশ্রয়ী করে অঙ্কণ করেছেন। ভারতবাসীর অন্তঃস্বভাবের বৈশিষ্ট্য খুলে দেখানোই এখানে লেখকের মূল উদ্দেশ্য। ভারতবাসীর শান্তিপূর্ণভাবে অলস জীবন যাপন, গোলামী মনোবৃত্তি প্রভৃতি ব্যাপারকে এক অদ্ভূত বর্ণনাভঙ্গীতে আমাদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখক। ভারতবাসীর এই স্বভাবকে নিয়ে কৌতুক করেছেন।

আপাতদৃষ্টিতে যে কাহিনি ত্রৈলোক্যনাথ ‘লুল্লু’ গল্পে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তার প্রধান চরিত্র আমীর সেখ। স্ত্রীকে নিয়ে তার ছোট্ট সংসার। একদিন গভীর রাত্রিতে আমীর সেখ তাঁর স্ত্রীকে ‘লে লুল্লু’ বলে ভয় দেখায় এবং সত্যিই লুল্লু নামে একটি  ভূত সেখানে হাজির ছিল। ‘লুল্লু’ আমীরের কথাকে আদেশ মনে করে আমীরের স্ত্রীকে নিয়ে চলে যায় নিজের আস্তানায়। এরপর অপহৃতা স্ত্রীর খোঁজে আমীর ফকিরি বেশ ধারণ করে। একজন গনৎকারের

কাছ থেকে আমীর জানতে পারে তাঁর স্ত্রী লুল্লু নামক একটি ভূতের দ্বারা অপহৃতা হয়েছে। এরপর রোজা ধরে নানা অলৌকিক কার্য সম্পাদন করে লুল্লুর আস্তানায় গিয়ে পৌঁছায় আমীর। চন্ডুর দ্বারা লুল্লুকে বশ করে নিজ স্ত্রীকে উদ্ধার করে আমীর। শুধু তাই নয় এরপর থেকে চন্ডুর প্রভাবে লুল্লু ও ভূতের দলবল আমীরের সম্পূর্ণ বশীভুত হয়ে পড়ে।

এ হল গল্প কাহিনির সারাংশ মাত্র। এই সারাংশটি আসলে গল্পের মর্মকথার আবরণ। এই আবরণ ভেদ করে গল্পের অন্দর মহলে প্রবেশ করা মাত্রই 'লুল্লু' গল্পের প্রকৃত তাৎপর্য উন্মোচিত হয়ে যায় পাঠকের সামনে। 'তাঁতী' নামাঙ্কিত তৃতীয় অধ্যায়ে ভূতকে তাঁতীর গান শোনানোর প্রসঙ্গে ও 'ভূতের তেল' নামাঙ্কিত ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভূতকে ঘানিতে ফেলে ভূতের তেল বের করার প্রসঙ্গে হাসি আছে যথেষ্ট। কিন্তু এই হাসির আড়ালে সবসময়ই সক্রিয় থেকেছে নীতিহীনতার প্রতি বিদ্রূপ। ভূতের আড়ালে সমাজের মানুষগুলিকে নিয়ে ব্যঙ্গের ফানুস উড়িয়েছেন ত্রৈলোক্যনাথ 'লুল্লু' গল্পে। লুল্লু, ঘ্যাঁঘো, গোঁ গোঁ প্রভৃতি ভূত তো আসলে মানুষই। তাদের বলা যেতে পারে মানুষ ভূত। মানুষের প্রাণবধ থেকে আরম্ভ করে পরস্ত্রী হরণ, মিথ্যাচার, লোক ঠকানো ইত্যাদি সমস্তরকম অন্যায় কাজে এরা লিপ্ত থাকে। এই ভূতদের যথার্থ স্বরূপ উন্মোচন করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ এভাবে :

> ''... যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, অন্ধকার জমিয়া তেমনি ভূত হয়। জল জমাইয়া বরফ করিবার কল আছে, অন্ধকার জমাইয়া ভূত করিবার কল কি সাহেবরা করিতে পারে না? অন্ধকারের অভাব নাই। নিশাকালে বাহিরে তো অল্প-স্বল্প অন্ধকার থাকেই। তারপর মানুষের মনের ভিতর যে কত অন্ধকার আছে, তাহার সীমা নাই, অন্ত নাই। কোদাল দিয়া কাটিয়া কাটিয়া ঝুড়ি পূরিয়া এই অন্ধকার কলে ফেলিলেই প্রচুর পরিমাণে ভূত প্রস্তুত হইতে পারিবে।''[১৬খ]

সমাজের প্রায় সর্বত্রই এই ভূতদের অবস্থান। কোথাও রোজা রূপে, কোথাও সংবাদপত্র সম্পাদক রূপে, কোথাও বা ধর্মের রক্ষক হিসেবে এরা স্বমহিমায় বিরাজিত। ত্রৈলোক্যনাথ অত্যন্ত সরস ভাষায় এই তদের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপকে বিদ্রূপ করেছেন 'লুল্লু' গল্পে। যে রোজার প্রতি ভারতবাসীর ছিল পরম আস্থা, যে রোজাকে মানুষ তার বিপদে আপদে পরম আশ্রয়স্থল বলে বিশ্বাস করত সে যে কতটা ভ্রান্ত তা জানা যায় 'তাঁতী' নামাঙ্কিত গল্পে রোজার স্বীকারোক্তিতে :

> ''তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি। আমি প্রকৃত রোজা নই, ভূত ছাড়াইবার একটি মন্ত্রও জানি না। এমনকি গায়ত্রী পর্যন্ত জানি না, আর লেখা পড়া বিষয়ে, ক খ পর্য্যন্ত শিখি নাই। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে আমি একজন পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।''[১৭]

—এই স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে শুধু রোজা নয় মুখোশধারী ব্রাহ্মণদেরও প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে যায়। শুধু রোজা নয় ভুঁই ফোঁড় সংবাদপত্র সম্পাদক হিসেবেও এই ভূতদের রমরমা। আমীর গোঁ গোঁ ভূতকে তার পত্রিকার সম্পাদক করতে চাইলে গোঁ গোঁ তার লেখাপড়া না জানার কথা বলে। একথা শুনে আমীর বলে :

'' পাগল আর কি! লেখা-পড়া জানার আবশ্যক কি? গালি দিতে জানিস ত'?''

গোঁ গোঁ বলিল,—''ভূতদিগের মধ্যে যে সকল গালি প্রচলিত আছে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি।''

আমীর বলিলেন—''তবে আর কি! আবার চাই কি? এতদিন লোকে মানুষ মারিয়া সম্পাদক করিতেছিল, কিন্তু মানুষে যা কিছু গালি জানে, মায় অশ্লীল ভাষা পর্য্যন্ত, সব খরচ হইয়া গিয়াছে; সব বাসি হইয়া গিয়াছে। এখন দেশসুদ্ধ লোককে ভূতের গালি দিব। আমার অনেক পয়সা হইবে।''[১৮]

এভাবেই ত্রৈলোক্যনাথ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাকা এই ভূতরূপী মানুষদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন। ত্রৈলোক্যনাথ জানেন যে যতদিন পর্যন্ত এই ভূতেরা স্বমহিমায় বিরাজিত থাকবে তত দিন দেশ ও জাতি নানা সমস্যায় জর্জরিত থাকবে। তাই অবিলম্বে এই ভূতগুলিকে বিনাশ করা দরকার। ঠিক যেমনভাবে আমীর গোঁ গোঁ ভূতের দেহ থেকে ভৌতিক তেল নিস্কাষণ করে তার সাহায্যে গভীর সমস্যা থেকে মুক্ত হয়েছে ঠিক তেমনভাবে সমস্ত ভূতের দেহ থেকে অন্ধকাররূপী তেল নিস্কাষণ করেই অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা করতে হবে জাতিকে।

ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন যুক্তিবাদী মানুষ। এ অন্ধকার দেশে তিনি চেয়েছিলেন চেতনার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে। যে দেশের প্রায় সর্বত্রই বিরাজ করে রূপকথার গা ছমছম করা তেপান্তরের মাঠ, যেখানে সর্বত্র মানুষের মধ্যে থাকে ভূত-প্রেত, রাক্ষস, খোক্কস, পেত্নী, ব্রম্মদত্যির উজ্জ্বল উপস্থিতি সেখানকার মানুষদেরকে জাতে তুলতে গেলে দরকার তাদের মধ্যে জ্ঞানের আলোক সঞ্চারিত করে দেওয়া। শিক্ষা থেকেই এই জ্ঞানের আলোক পাওয়া যেতে পারে বলে ত্রৈলোক্যনাথ মনে করতেন। সে শিক্ষা ইংরাজীও হতে পারে। যতদিন না পর্যন্ত এই শিক্ষার প্রসার হচ্ছে ততদিন ভূতেরাও স্বমহিমায় ভারতবর্ষের সমাজে বিরাজিত থাকবে। ত্রৈলোক্যনাথের অঙ্কিত ভূত তো নিজেই স্বীকার করেছে :

''আমার অবধ্য, সেই ইংরেজী-পড়া বাবুলোক। তাঁহাদের ভয়ও করি, ভক্তিও করি। ভয় করি, কেননা এটা সেটা খাইয়া তাঁহাদের মনের কোঁচকা ঘুচিয়া যায়, মন সরল হইয়া যায়। এই মর্ত্ত্যলোকেই তাঁহারা সদাশিবত্ব প্রাপ্ত হন, অন্য লোকের মত তাঁহাদের মন জিলেপির পাক বিশিষ্ট নয়।''[১৯]

প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের প্রভাবে ইতিমধ্যেই যতটুকু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটেছে ততটুকুতেই ভূতদের ত্রাহী-ত্রাহী অবস্থা। 'লুল্লু' গল্পের ভূত নিজেই সেই অবস্থার কথা স্বীকার করেছে :

> ''কিন্তু ইংরেজের প্রভাবে আমাদের সকল ব্যবসাই একরূপ লোপ পাইয়াছে। অন্য ব্যবসার কথা দূরে থাকুক, ভূতদিগের ভূতে পাওয়ার ব্যবসাটি পর্য্যন্ত লোপ হইয়া গিয়াছে। এই হতভাগ্য দেশের লোকগুলো এমনই ইংরেজী ভাবাপন্ন হইয়াছে যে, কাহাকেও ভূতে পাইলে কি ডাইনে খাইলে, বলে কিনা হিষ্টিরিয়া হইয়াছে।''[২০]

'ভুত ও মানুষ' গল্পগ্রন্থেরই 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' গল্পটি ত্রৈলোক্যনাথের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। গল্পটির আদ্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে বৈঠকী মেজাজ। ত্রৈলোক্যনাথের বেশীরভাগ গল্পের মতো এ গল্পেরও মূল লক্ষ্য ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ। ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন সমাজ সচেতন শিল্পী। ধর্মের নামে অতিশয্যতা, ধর্মকে কেন্দ্র করে ব্যবসা, এগুলিকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। মানুষ ধর্মের কাছে যে কতটা দুর্বল, আর এই ধর্মকে কেন্দ্র করে একশ্রেণির মানুষ কীভাবে অন্যদের ভুল পথে পরিচালিত করে নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করে 'নয়ন চাঁদের ব্যবসা' গল্পটিতে রয়েছে তার সার্থকতম নিদর্শন।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়নচাঁদ। নয়নচাঁদ এমনিতে গরীব মানুষ, গুলিখোর বলেই তিনি সকলের কাছে পরিচিত। কিন্তু বর্তমানে তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়েছে। নয়নচাঁদ তাঁর উন্নতির রহস্য বন্ধুদের কাছে গল্প করে শুনিয়েছে। একবার কলকাতায় বসন্ত রোগের হিড়িক পড়েছিল। এই সুযোগে নয়নচাঁদ একটি মাটির শীতলা ঠাকুর তৈরী করলেন কারণ শীতলা ঠাকুর বসন্ত উপশমের দেবী বলে পরিচিত। মাটির শীতলা ঠাকুরের মূর্তিটি নিয়ে তিনি গেলেন কলকাতায়। শীতলা হাতে করে প্রতিদিন তিনি ভিক্ষায় বেড়োতেন। পাড়ায় তাঁর বিলক্ষণ প্রসার প্রতিপত্তি হল। নয়নচাঁদের কথায় : ''বলিব কি ভাই আর রোজগারের কথা। ধামা ধামা চাল আর গন্ডা গন্ডা পয়সা। ধামায় যেন পয়সা বৃষ্টি হইতে লাগিল।''[২১] অল্পদিনের মধ্যেই প্রচুর পয়সার মুখ দেখলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ করে তিনি একটি সমস্যায় পড়লেন। একদিন সকালে তিনি একটি মাতালের বাড়িতে হাজির হয়ে যেমনি শীতলার গীত আরম্ভ করেছেন তেমনি সেই মাতাল এসে নয়নচাঁদের পিঠে দুমদাম কিল মারতে থাকে এবং শীতলা কেড়ে নেয়। এই ঘটনার পর নয়নচাঁদ এই ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং কলকাতা ছেড়ে নিজ গ্রামে ফিরে যেতে মনস্থ করেন। কিন্তু পাঁচ সাতদিন পর একটি চিঠি পেয়ে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন। চিঠিতে লেখা ছিল :

''শীঘ্র আসিয়া তোমার শীতলা লইয়া যাইবে। তোমার এ জাগ্রত শীতলা। এ শীতলা লইয়া আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। তোমার কোন ভয় নাই। শীঘ্র তোমার শীতলা লইয়া যাইবে।''[২২]

যাওয়ার ব্যাপারে প্রথমে কিছুটা দ্বিধা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর শীতলাটি ফিরিয়ে আনতে গেলেন। কিন্তু গিয়ে তিনি দেখলেন এক অদ্ভুত কান্ড।—ঘরের ভিতর বসে আছে দুটি ভূত। আসলে যে মাতাল নয়নচাঁদের কাছ থেকে শীতলাটি কেড়ে নিয়েছিল তার নাম মিত্তির জা। শীতলা কেড়ে নেওয়ার দুদিন পড়েই মিত্তির জা বসন্ত রোগের দ্বারা আক্রান্ত হন। তিনদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। মিত্তির জা তাঁর জীবিতকালে নরহত্যা, ব্রাহ্মণ হত্যা, গো হত্যা, স্ত্রী হত্যা, চুরি জাল প্রভৃতি সমস্ত রকমের পাঁপ কর্ম করেছিলেন। তাই অন্তিমকালে একটি পুণ্য কাজ করার অভিপ্রায়ে তাঁর গোয়ালের এঁড়ে বাছুড়টি একজন ব্রাহ্মণকে দান করে গেলেন। এরপর তিনি যখন যমপুরীতে যমরাজের সম্মুখে হাজির হলেন তখন যমরাজ তাঁর পাপপুণ্যের হিসেব দেখতে চিত্রগুপ্তকে আদেশ দিলেন। দেখা গেল : ''পুণ্য ইহার কিছু মাত্র নাই, কেবল পাপ।'' পুণ্য বলতে মৃত্যুকালে ব্রাহ্মণকে এঁড়ে বাছুর দান। যমরাজের জিজ্ঞাসার উত্তর ধরে সে জানায় যে সে আগে পুণ্যের ফল ভোগ করতে চায়। স্থির হয় পুণ্যের ফল হিসেবে মিত্তির জা যে এঁড়ে বাছুরটি ব্রাহ্মণকে দান করেছিলেন সেটি একদিনের জন্য তাকে দেওয়া হবে এবং এঁড়ে বাছুরটিকে দিয়ে সে যা খুশি করাতে পারবে। এঁড়ে বাছুরটি পাওয়ার পর মিত্তির জা তাকে আদেশ করলেন :

''এঁড়ে গরু! তবে এক কাজ করো। তোমার একটি সিং যমের নাভিকুন্ডলে প্রবেশ করিয়া দাও, আর একটি সিং চিত্রগুপ্তের নাভিকুন্ডলে দিয়া, আজ সমস্ত দিন দুইজনকে বন্-বন্ করিয়া চরকীর পাক্ খাওয়াও।''[২৩]

—সঙ্গে সঙ্গে এঁড়ে গরুটি আদেশ পালনে উদ্যত হল। যম, চিত্রগুপ্ত দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে হাজির হল বৈকুণ্ঠে নারায়ণের কাছে। অবশেষে নারায়ণ এঁড়ে গরুটিকে সাময়িকভাবে শান্ত করলেন। যমপুরি বিপদমুক্ত হল। এরপর নারায়ণ গিয়ে মিত্তির জাকে শান্ত করলেন। মিত্তির জা নিজেকে এবং যমপুরীর সমস্ত পাঁপীকে বৈকুণ্ঠে আশ্রয় দেওয়ার অনুরোধ জানালেন। নারায়ণ এতে রাজী হলেন। তখন যমপুরীর সমস্ত পাঁপী বৈকুণ্ঠে গিয়ে হাজির হলেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠের দ্বারে সুদর্শন চক্র সকলকে প্রবেশ করতে দিলেও কেবল মিত্তির জাকে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করতে দিল না। এর কারণ হিসেবে নারায়ণের কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন নয়নচাঁদের শীতলাটি নয়নচাঁদকে ফিরিয়ে দেওয়া না পর্যন্ত তার বৈকুণ্ঠে স্থান হবে না। তাই এখন তিনি ভীত হয়ে নয়নচাঁদের শীতলা ফিরিয়ে দিতে এসেছেন। পুনরায় শীতলা পাওয়ার পরে নয়নচাঁদের পসার দশ গুণ বেড়ে গেল। নয়নচাঁদ গল্প করল :

''কলেজের সেই যারা এম-এ পাশ দিয়াছে, সভা করিয়া তাহারা আমার শীতলার বক্তৃতা করিল। খবরের কাগজে আমার শীতলার নাম উঠিল। ফিরিঙ্গিরা আসিয়া আমার শীতলার পূজা দিতে আরম্ভ করিল। একদিন লোক সব হাঁড়ি-চড়ানো বন্ধ করিয়া খই-কলা খাইয়া রহিল। আমার বুজরুকি চারিদিকে খুব জাহির হইল।''[২৪]

ক্রমে তিনি বসন্তের ডাক্তার হলেন। বলতে দ্বিধা নেই ধর্মের নামে ভন্ড ব্যবসাধারী এবং সেই সঙ্গে সেই ব্যবসার পরিপোষক হুজুগে শিক্ষিত বাঙ্গালী এখানে ত্রৈলোক্যনাথের কটাক্ষের লক্ষ্য।

ত্রৈলোক্যনাথের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'মুক্তামালা'। এই গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত গল্পগুলি বাংলাসাহিত্যের এক ভিন্নধর্মী কথাসাহিত্যের পথ নির্দেশক। বৈঠকী মেজাজ, ভূতপ্রেতের গল্প বলা, অলৌকিক রূপকথার সমন্বয়েই গল্প বলার যে স্বাভাবিক প্রবণতা ত্রৈলোক্যনাথের অন্যান্য গল্পে উপস্থিত, 'মুক্তামালা' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে তা একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন তিনি। এর প্রমাণ অবশ্য আমরা গল্পের মধ্যে পাই :

''যাদব বলিলেন,—''কি গল্প শুনিতে ইচ্ছা করেন? একটা ভূতের গল্প করিব?'' মহাদেববাবু উত্তর করিলেন, —''নতুন ধরনের ভূতের গল্প হয় তো বল। পচা গল্প শুনিতে ইচ্ছা হয় না।''[২৫]

গল্পের মধ্যে গল্প বলা, একই গল্পে বিভিন্ন সময় গল্পকথকের পরিবর্তন ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আর 'মুক্তামালা'র গল্পগুলিতে এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সার্থকতম প্রতিফলন ঘটেছে। 'মুক্তামালা' গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'মুক্তামালা'। গল্পটির আদ্যন্ত রয়েছে বৈঠকী মেজাজ। মহাদেববাবু আড্ডার আড্ডাধারী, দলের দলপতি। সেই মজলিসে যাদব, মাধব, রাঘব, ত্রিলোচন, গদাধর, ঘনশ্যাম প্রভৃতি বন্ধুগন নিয়মিত উপস্থিত থাকেন। ঘনশ্যামবাবুই এখানে প্রধান গল্পকথকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ঘনশ্যামবাবু আমাদের কাছে গল্পকথক হলেও তার কাছে গল্পকথক সুবল গড়গড়ি। ঘনশ্যামবাবু বলেছেন :

''যাঁহার নিকট আমি এ গল্প শুনিয়াছি, তাঁহার নাম সুবল গড়গড়ি। আমার নিজের কথায় আমি এ গল্প করিব না; গড়গড়ি মহাশয় যেভাবে আমাদের বাসায় বলিয়াছিলেন, আমিও সেইভাবে তাঁহার কথায় গল্পটি করিব।''[২৬]

সুতরাং গল্পের আসল কথক সুবল গড়গড়ি।

'মুক্তামালা' গল্পের বিষয় সুবল গড়গড়ির জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনি। মানভূম জেলার একটি গ্রামে সুবল গড়গড়ির বাস। পিতার মৃত্যুর পর সুবলচন্দ্র গড়গড়ি কনিষ্ট ওক্কুরকে লেখাপড়া শেখাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। সেই উদ্দেশ্যেই কলকাতার একটি ভালো স্কুলে ভর্তিও করে দিলেন তাকে। কিন্তু ক্রমশ তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন। কুসঙ্গে পড়ে ওক্কুরের পড়াশুনা

মাটি হল। এমতাবস্থায় ভাইয়ের পড়াশুনা হবে না বুঝতে পেরে ভাইকে বিয়ে করানোর কথা ভাবতে থাকেন তিনি। কিন্তু ওক্কুর এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। কলকাতায় থেকে বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে উদার হস্তে খরচ করার নেশায় সে তখন মত্ত। বড় ভাইয়ের কাছে টাকার দাবিও তার ক্রমশঃ বেড়ে চলে। ক্রমে পৈতৃক বিষয়ের সেও একজন অংশীদার, অর্দ্ধাংশের উপর তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে একথাও সে বড় ভাইকে স্মরণ করিয়ে দিল। এতে বড় ভাই যারপর নাই দুঃখিত হলেন। কিন্তু ওক্কুর নাছোরবান্দা। ষড়যন্ত্র করে সে বড় ভাইকে পাগল প্রতিপন্ন করল। পাগলের ওষুধ খেয়ে সুবলচন্দ্র অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। অজ্ঞান অবস্থায় তিনি যে স্বপ্ন দেখলেন তাই 'মুক্তামালা' গল্পগ্রন্থের অন্যান্য গল্পগুলির বিষয় হয়েছে। যে স্বপ্ন তিনি দেখলেন তা অলৌকিক, এক কথায় বাস্তবে অসম্ভব। স্বপ্নে তিনি ডাকিনীর রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ডাকিনীর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য মায়ের মন্দিরে মায়ের দ্বারস্থ হলেন তিনি। মায়ের হাতে ও গলদেশে অবস্থিত যে কোন একটি নরমুন্ড নিয়ে যেতে পারলে সুবল ডাকিনীর হাত থেকে উদ্ধার পাবে। সুবল একথা মুন্ডদের জানালে মুন্ডগণ এক এক করে তাদেরকে গল্প বলতে থাকে এবং প্রত্যেকটি গল্প বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুন্ডগুলি রক্ত মুক্তায় পরিণত হয়।

'মুক্তমালা' গল্পগ্রন্থের 'গুরুদেব' গল্পে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জীব মানুষের নিষ্ঠুরতার চরম রূপ দেখানো হয়েছে। সহমর্মিতার নিরিখে, দয়াধর্মের নিরিখে যে মানুষ নিজেদেরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে বড়াই করে সেই মানুষের নীতিজ্ঞানহীনতার বীভৎসরূপ তুলে ধরেছেন ত্রৈলোক্যনাথ এই গল্পে গুরুদেব চরিত্রের মাধ্যমে। ড. অজিত কুমার ঘোষ এই চরিত্রটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন :

> ''ত্রৈলোক্যনাথ অঙ্কিত সর্বাপেক্ষা নৃশংস চরিত্র বোধহয় 'মুক্তামালা'র গুরুদেব। সেই গুরুদেবের আত্যন্তিক নির্দয়তার চিত্র অঙ্কণ করিতে যাইয়া লেখক অসহিষ্ণু বেদনা ও ক্রোধে হাসিতে পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ছাগল হত্যার যে বীভৎস দৃশ্য তিনি বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে গুরুদেবেকে মানুষের পর্যায়ে ফেলিতে আমাদের দ্বিধা হয়।''[২৭]

গুরুদেবের নাম গোলক চক্রবর্তী। তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। লেখাপড়া জানেন না। নিজের নামটিও সই করতে পারেন না। বাড়ি গ্রামে হলেও বারো মাস কলকাতাতেই থাকেন। প্রথমে হোটেল ব্যাবসা খুললেও সে ব্যাবসায় লাভ না হওয়াতে তিনি মাংসের দোকান খোলেন। এই পর্যন্ত ঠিকই আছে কিন্তু এরপর তার ক্রিয়াকলাপ যতই আমরা পাঠ করি ততই তার চরিত্রের নিষ্ঠুরতা আমাদেরকে এতটাই বিস্মিত করে তোলে যে আমরা নিন্দার ভাষা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলি। তাঁর নিষ্ঠুরতার একটা চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে। সুবল গড়গড়ি বলেছেন :

''আমি বললাম,—ঠাকুর মহাশয়। আপনার ছাগলগুলির বোধহয় বড় জল পিপাসা পাইয়াছে।''

গুরুদেব উত্তর করিলেন, —''দুই-একদিনে সমুদয় শেষ হইয়া যাইবে। জল দিবার আর আবশ্যক নাই।''

আমি বলিলাম,—''উহাদের ক্ষুধাও বোধহয় পাইয়াছে।''

গুরুদেব বলিলেন, —''ক্ষুধা নিশ্চয় পাইয়াছে। আজ তিনদিন উহাদিগকে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি।''

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—''উহাদিগকে কি খাইতে দেন ?''

গুরুদেব উত্তর করিলেন,—''খাইতে। খাইতে আবার কি দিব? খাইতে দিলে আর ব্যবসা চলে না।''

আমি বলিলাম,—''এরূপ কয়দিন অনাহারে থাকে?''

গুরুদেব বলিলেন,—''সাত-আট দিনের অধিক ইহাদিগকে অনাহারে থাকিতে হয় না। সাত-আট দিনের মধ্যেই এক এক খেপ শেষ হইয়া যায়।''

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—''একটু একটু জল পান করিতে দেন না কেন?''

গুরুদেব উত্তর করিলেন,—''উহারা গায়ে গায়ে দাঁড়াইয়া আছে। পিপাসায় উহাদের জ্ঞান নাই। জল দিলে বড়ই গোলমাল করে।''... ''[২৮]

নিষ্ঠুরতার এখানেই শেষ নয়, তা চরম সীমা স্পর্শ করেছে পাঁঠা কাটার দৃশ্যে :

''পাঠাকে ফেলিয়া ঠাকুর মহাশয় তাহাকে সেই খোঁটায় বাঁধিলেন। তাহার পর তাহার মুখদেশ নিজের পা দিয়া মাড়াইয়া জীয়ন্ত অবস্থাতেই মুন্ডদিক হইতে ছাল ছাড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পাঁঠার মুখ গুরুদেব মাড়াইয়া আছেন, সুতরাং সে চীৎকার করিয়া ডাকিতে পারিল না।''[২৮]

এভাবে জীয়ন্ত অবস্থায় পাঁঠার ছাল ছাড়ানোর যুক্তি হিসেবে গুরুদেব অবলীলায় বলে যান :

''জীয়ন্ত অবস্থায় ছাল ছাড়াইলে যাতনায় ইহার শরীর ভিতরে ভিতরে অল্প কাঁপিতে থাকে। ঘন ঘন কম্পনে ইহার চর্ম্মে একপ্রকার সরু সরু সুন্দর রেখা অঙ্কিত হইয়া যায়। এরূপ চর্ম্ম দুই আনা অধিক মূল্যে বিক্রিত হয়। জীয়ন্ত অবস্থায় পাঁঠার ছাল ছাড়াইলে আমার দুই আনা পয়সা লাভ হয়। ব্যবসা করিতে আসিয়াছি, বাবা। দয়ামায়া করিতে গেলে আর ব্যবসা চলে না।''[২৮]

আসলে সমাজে যারা অসহায়, যারা দুর্বল তাদের প্রতি ছিল ত্রৈলোক্যনাথের অসীম সহানুভূতি। সে শিশু অথবা নারী অথবা পশু যেই হোক না কেন। তাই যেখানেই তিনি

দেখেছেন দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার সেখানেই তার লেখনী প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। গল্পটির মধ্যে একটি রূপকভাবনাও কাজ করেছে। ভারতীয় সমাজে বিত্তবান সম্প্রদায় সমাজের সাধারণ মানুষের উপর যুগ যুগ ধরে যে কশাইবৃত্তি অবলম্বন করেছে তারই একটি প্রতিচ্ছবি বলা যেতে পারে গল্পটিকে।

'মুক্তামালা' গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প—'আদুরি ও আরসী'। অনেক সময় সামান্য কিছু ভুলত্রুটির অন্তরালে আত্মগোপন করে থাকে অসামান্য সাফল্য—এই সত্যটি সত্যি হয়ে উঠেছে 'আদুরি ও আরসী' গল্পে। 'ভূতের বাড়ি' গল্পটি সত্যিই ভুতের গল্প হয়ে উঠেছে। 'পুরাতন কূপ' গল্পটিতে দেখি একদিকে যখন সিপাহী বিদ্রোহের আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তখন একশ্রেণির লোক পকেট ভর্তি করেছে লুঠতরাজ হত্যা প্রভৃতির মাধ্যমে। পাশাপাশি দুটি শিশুর সারল্য, পাঁড়েশির মানবিকতাবোধ প্রভৃতিও গল্পে দেখানো হয়েছে। 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিলে, জীবের প্রতি দয়া করিলে, ভগবান প্রসন্ন হন'—তা 'শম্ভু ঘোষের কন্যা' গল্পটির বিষয়।

মদের নেশা ও পরনারীর প্রতি আসক্তি মানুষের জীবনে কী ভয়ঙ্কর পরিণাম ডেকে আনে তার জ্বলন্ত প্রমাণ 'ললিত ও লাবন্য' গল্পে ললিত ও লাবণ্যের পিতা চরিত্রটির মধ্যে আমরা পাই। সেই লোকটির নির্মমতা চরমসীমা স্পর্শ করে যখন নিজ পুত্র ললিতের উপহারপ্রাপ্ত বই বিক্রি করে নিজ আহ্লাদ পরিপূর্ণ করেন। লেখক বর্ণনা করেছেন :

> ''পুস্তকগুলি পিতার নিকট রাখিয়া ললিত চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে পিতা পুস্তক দুইখানি বাজারে লইয়া বিক্রি করিলেন। নয় আনা পয়সা হইল। সেই ন আনা পয়সায় মদ খাইয়া প্রতিদিন যে স্থানে তিনি রাত্রি যাপন করেন, সেই স্থানে গিয়া রাত্রি যাপন করিলেন।''[২৯]

পাশাপাশি ললিত ও লাবণ্যের কাকার স্নেহ, মায়া মমতার পরিচয়টিও খুব সুন্দরভাবে এই গল্পে পরিস্ফুট হয়েছে। 'মূল্যবান তামাক ও জ্ঞানবান সর্প' গল্পটিতে রয়েছে কথকতা রীতির অনুসরণ। ত্রৈলোক্যনাথের চিরপরিচিত আড্ডার আসর, গাঁজার ধুম এই গল্পেও বিদ্যমান। এ গল্পের কথক তিনুবাবু, আর শ্রোতা মানিকবাবু, নবীনবাবু, হরেনবাবু, গণেশবাবু ও আড্ডাধারী জয়গোবিন্দ মশায়। তিনুবাবু পরপর পাঁচটি গল্প বলেন। 'বালিকা ও কৃষ্ণ সর্প, 'শিশু ও বেঁড়ে', 'গরুর দাড়ি', 'চুল বাঁধা ফিতে', 'পাকা মুহরী' প্রভৃতি পাঁচটি গল্পে তিনুবাবু সাপের যে অসাধারণ কার্যাবলীর কথা গল্পের আকারে আমাদের শুনিয়েছেন তা যথেষ্ট কৌতুককর।

ত্রৈলোক্যনাথের জগৎ আজগুবির জগৎ। তাঁর হাস্যরসের মূল উপাদান বহু ক্ষেত্রেই এই আজগুবির জগৎ থেকেই উৎসারিত। ভুত, বাঘ, হাতি, ব্যঙ, মশা, সাপ ও তাদের বিভিন্ন

কর্মকান্ড নিয়ে গঠিত হয়েছে এই আজগুবির জগৎ। এদের মধ্যে মানবিক স্বভাব ও আচরণ আরোপ করার ফলে সৃষ্টি হয়েছে কৌতুকরস। 'মূল্যবান তামাক ও জ্ঞানবান সর্প' গল্পটিতে রয়েছে সাপের বিভিন্ন কর্মকান্ডের অদ্ভূত পরিচয়। এ সাপ আবার যেমন তেমন সাপ নয় এ সাপ হাসতেও জানে : ''আহ্লাদে আটখানা হইয়া সাপটি হাসিতে লাগিল।'' শুধু তাই নয় এ সাপ মুড়িও খায়। তিনুবাবুর মুখ থেকে জানা যায় : ''চিনিতে পারিয়া ধামি হইতে আমার মেয়ে তাহাকে দুগাল মুড়ি দিল। কুড় কুড় কুড় কুড় করিয়া সাপ বসিয়া সেই মুড়িগুলি খাইল। মুড়িগুলি খাইয়া সে পুনরায় বনে চলিয়া গেল।''[৩০]

এই গল্পটিতে রূপকের আবরণ সেভাবে চোখে পড়ে না। ত্রৈলোক্যনাথের অন্যান্য গল্পে ভূত ও ইতর প্রাণীর মধ্য দিয়ে মানবীয় জগতের দোষ বিকৃতি উদঘাটনের যে চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় এই গল্পে সেই প্রচেষ্টা অনুপস্থিত। সহজ সরল কৌতুকরসের উৎসারই এই গল্পটির মূল প্রেরণা বলে মনে হয়।

'সেকালের মোহর' গল্পটিতে আমরা পরিচিত ত্রৈলোক্যনাথকে পাই না। গল্পটি অনেকটাই সামাজিক ও গার্হস্থ্যমূলক। রোমান্টিকতারও কিছুটা স্পর্শ চোখে পড়ে এখানে। গল্পের নায়ক গিরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় গিরিশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় সরলা নাম্নী এক বালিকার। সরলা অসুস্থ পিতার জন্য চিকিৎসকের সন্ধানে বের হয়েছিল। নিজে ডাক্তারীর ছাত্র হওয়ায় গিরিশ মেয়েটিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সরলার পিতাকে চিকিৎসা করে তোলে সে। সরলাদের বাড়িতে যাওয়া আসার সূত্রে গিরিশ গোপীবাবুর ডাক্তার খানায় চাকরী পায়। কিন্তু এই সময় গোপীবাবুর বাড়িতে মোহর চুরির ঘটনা গিরিশের জীবনকে অন্য দিকে মোড় নিতে বাধ্য করে। গিরিশকে মোহর চুরির দায়ে অভিযুক্ত করা হয় যদিও সরলার তৎপরতায় গিরিশ সে যাত্রায় রক্ষা পায় কিন্তু মোহর চুরির দায়ে অভিযুক্ত করে গিরিশকে প্রচন্ডভাবে প্রহার করার ফলে গিরিশ ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। একদিন গিরিশ যখন মুমূর্ষু অবস্থায় শয্যাশায়ী গোপীবাবু তখন হারানো মোহরগুলি ফিরে পান এবং গিরিশের এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র হাত ছিল না বুঝতে পেরে প্রচন্ড অনুতপ্ত হন। এর পর নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গোপীবাবু তাঁর সমস্ত মোহর গিরিশকে দান করতে চাইলেন। কিন্তু নির্লোভ গিরিশ সে দান গ্রহণ করলেন না। অবশেষে গিরিশ মৃত্যুমুখে পতিত হন। অবশ্য তার আগে নিজ স্ত্রী ও কন্যা যাতে অনাথ না হয়ে যায় সে ব্যবস্থাও করে রাখেন তিনি।

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে শৈল্পিক ত্রুটি রয়েছে প্রচুর। বহু ক্ষেত্রেই তিনি অবাস্তব কাহিনি গল্পের মধ্যে জুড়ে দিয়েছেন। যেখানে তিনি অবাস্তব কাহিনি অঙ্কণ করেছেন সেখানে পাঠকমন সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই বাস্তবের ঊর্ধ্বে নিজেকে নিয়ে গিয়ে তার রসাস্বাদন করতে প্রস্তুত। কিন্তু

যেখানে বাস্তব মানুষের অতি পরিচিত গল্প বলেছেন তিনি যার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের চিত্তে নীতিবোধের উদ্বোধন করা, সেখানেও যখন তিনি অবাস্তব কাহিনি ফাদেন তখন তা শৈল্পিক ত্রুটি হিসেবে পরিগণিত হয়। 'সেকালের মোহর' গল্পটিতে দেখি :

> ''কন্যাকে লইয়া মাধব চক্রবর্তী আদালতে উপস্থিত হইলেন। হাকিম তৎক্ষনাৎ সরলার সাক্ষ্য গ্রহন করিলেন। সরলাকে বড় অধিক কিছু বলিতে হইল না। গিরিশের পক্ষ হইয়া সরলার আগমন, তাহাই যথেষ্ট হইল। এরূপ সুশীলা স্বরূপা ভদ্র কন্যা যাহার সপক্ষ সাক্ষী, সে যে নির্দোষ, সরলাকে দেখিয়াই হাকিমের মনে সে বিশ্বাস জন্মিল। চুরি হইবার পূর্ব্বদিন গিরিশের নিকট তিনি মোহর দেখিয়াছিলেন, সরলাকে কেবল এই কথা বলিতে হইল। সরলার আন্তরিক ভাব হাকিম বুঝিতে পারিলেন। গিরিশকে ছাড়িয়া দিবার সময় ঈষৎ হাসিয়া তিনি সরলাকে বলিলেন : ''ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তোমরা দুজনে সুখী হও।''...''[৩১]

সরলার মত একজন বালিকার সাক্ষের ওপর নির্ভর করে আসামীকে বেকসুর খালাস করে দেওয়া এবং সরলা ও গিরিশের সুখী হওয়ার জন্য বিশেষ করে যাদের বিয়েই হয়নি তাদের সুখী হওয়ার জন্য হাকিমের প্রার্থনা অবিশ্বাস্য ঠেকে বই কি!

আসলে সাহিত্য রচনার পিছনে ত্রৈলোক্যনাথের একটি লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্য হল মানুষের হিত সাধন। এক্ষেত্রে তিনি রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের মানসধর্মেরই সগোত্রীয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন :

> ''যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।''[৩২]

ত্রৈলোক্যনাথেরও মানসধর্মের মূল কথা ছিল তাই। ভারতবর্ষের কুসংস্কারে জর্জরিত স্বার্থান্বেষী মানুষগুলিকে তাই তিনি সুযোগ পেলেই নীতিকথা শুনিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের কর্মের মধ্যেই রয়েছে তাঁর যথার্থ সুখ। এই সুখের স্বরূপ সকলে উপলব্ধি করতে পারে না। 'সেকালের মোহর' গল্পে মৃত্যুপথযাত্রী গিরিশের কথায় ত্রৈলোক্যনাথের এই ভাবনার জগৎ উন্মোচিত হয়েছে :

> ''সকল লোক ঐ পবিত্র স্থানে যাইতে পারে না। এই পৃথিবীতে আসিয়া যাহারা সত্য-পথ হইতে বিচলিত হয় না, যাহারা কাহারও অনিষ্ট করে না; যাহারা দ্বেষ ও ঘৃণার চক্ষে কাহাকেও দর্শন করে না; যাহারা সেই সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষকে কখন বিস্মৃত

হয় না; যাহারা সর্ব্বদা তাঁহাকে হৃদয় সিংহাসনে অধিষ্টিত রাখিয়া জগতের হিতসাধনে জীবন অতিবাহিত করে,—কেবল তাহারাই সেই সুখের স্থানে গমন করিতে পারে, কেবল তাহারাই প্রিয়জনকে লইয়া ঐ স্থানে অনন্তকাল থাকিতে পায়। সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষকে বিস্মৃত হইয়া যাহারা অন্যরূপে জীবন অতিবাহিত করে, তাহাদের পরলোক অন্যরূপ। সেই স্থানে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।''[৩৩]

'কেন এত নিদয় হইলে' গল্পটিতে ত্রৈলোক্যনাথ একটু ভিন্নরকমের কাহিনি অঙ্কণ করেছেন। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কালের পুত্তলিকা' গ্রন্থে ত্রৈলোক্যনাথের ছোটগল্পগুলির বিষয় বৈচিত্র্যভিত্তিক যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তাতে তিনি এই গল্পটিকে ভূতের গল্পের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তবে অন্যান্য গল্পের সহজ সরল কৌতুকপ্রবণ মানসিকতার বদলে ত্রৈলোক্যনাথ এখানে অনেক বেশী গম্ভীর। গল্পের কাহিনি অনেকটা গোয়েন্দা কাহিনি ধাচের। পরিবেশ পরিস্থিতি গল্পভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমস্ত গল্প জুড়ে একটি গান পাঠকের কৌতুহলকে সদাজাগ্রত রাখে :

''কেন এত নিদয় হইলে?
অবসান নিশী, অস্ত গেল শশী,
দাসীরে ভুলিয়া নাথ কোথায় রহিলে।''[৩৪]

'বেতাল ষড়বিংশতি' গল্পটি অনেকটা অলৌকিকতাপ্রধান গল্প। এই গল্পের নায়ক গৌড়ীশঙ্কর নামে এক ব্রম্মণ যুবক। স্কুলমাষ্টারি করে তার কুড়ি টাকা আয় হলেও গৌড়ীশঙ্কর এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি রাতারাতি বড়লোক হতে চাইলেন। এই অভিপ্রায় সিদ্ধি করার জন্য তিনি শ্মশানে সাধনা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হল। শবসাধনা অর্ধপথে থামিয়ে দেওয়ায় বড়লোক তো তিনি হলেন-ই না উল্টে তার উপর ভর করল বেতাল। সেই দিনের পর থেকে রোজ রাত্রি তিনটার সময় তার পিঠে গুপগাপ শব্দে কিল পড়তে থাকে। কে কোথা থেকে এই কিল মাড়ে কিছুতেই বোঝা যায় না। এই দুরবস্থায় পড়ে গৌড়ীশঙ্কর যখন মুমূর্ষুপ্রায় এবং সকলেই গৌড়ীশঙ্করের বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছেন ঠিক তখনই পরিচয় হয় এক অল্পবয়স্ক লোকের সঙ্গে যিনি তাকে দুরবস্থা থেকে সম্পূর্ণ উদ্ধার করেছেন।

গল্পটি অলৌকিকতা প্রধান হলেও ত্রৈলোক্যনাথের পাঠক মন আকর্ষণ করার মূল উপাদান এখানেও কৌতুকরস। উদ্ভট ও বীভৎসরসের সমারোহে একটি ভিন্নরসের আস্বাদ পাই গল্পটি থেকে। গল্পটিতে ত্রৈলোক্যনাথের হাস্যরস সৃষ্টির বিভিন্ন কৌশল লক্ষনীয় যেমন :

বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি :

''রাতারাতি বড় মানুষ হইবার উপায় পৃথিবীতে বড় অধিক নাই,—একেবারে নাই বলিলেও চলে। কিন্তু গৌড়ীশঙ্কর সুবুদ্ধি লোক, সহজেই সে উপায় তিনি বাহির করিলেন।''[৩৫]

বর্ণনা কৌশলের মধ্য দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি :

''তাহার চীৎকারে অনেক লোকের কান হইতে পোকা বাহির হইয়া গিয়াছিল; অনেক লোকের কর্ণে তালি লাগিয়া গিয়াছিল; তাহা ভিন্ন চারি পাঁচজনের কর্ণ তন্তু ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। চারিপাঁচজনের কর্ণপটহে ছিদ্র হইয়া গিয়াছিল। সেই হতভাগারা জন্মের মত বধির হইয়া গিয়াছে।''[৩৬]

সিচুয়েশন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে হাস্যরস :

নির্জন শ্মশানে পালে পালে পিশাচ, ভুত-প্রেত, দৈত্য, ডাকিনী, শাকিনী, হাকিনী, ভৈরব, বটুক প্রভৃতি বসে গৌরীশঙ্করের চারিদিকে নৃত্য করিতে শুরু করল। তখন প্রচন্ড ভয়ে সে চোখ বন্ধ করে ভয় কাটানোর চেষ্টা করল ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনে হল ''ভূতপ্রেত কখন দেখি নাই, একবার চাহিয়া দেখি, ভুতপ্রেত কিরূপ হয়।'' এইরকম একটি বিপজ্জনক অবস্থায় একথা মনে হওয়ার মধ্যে যথেষ্ট কৌতুক রয়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথের জগতে সব কিছুই সম্ভব। আধুনিক বিজ্ঞান যেখানে ভূত প্রেতাত্মা, ডাকিনীর অস্তিত্ব বিন্দুমাত্র স্বীকার করে না সেখানে ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের নায়কেরা বারবার ভূত দেখে। 'বেতাল ষড়বিংশতি' গল্পেও গৌড়ীশঙ্কর ভূত দেখেছে :

''ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে সহস্র কৃমি দুলিতেছে। পাতালের ন্যায় মুখবিবর। মুখের ভিতর হইতে অনবরত রক্ত নির্গত হইতেছে। গজদন্তের ন্যায় বড়, কিন্তু বক্রাকার, ভীষন দন্ত। ললাটদেশে কেবল একটি গোলাকার চক্ষু। সে চক্ষু হইতেও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও সর্প বাহির হইতেছিল।''[৩৭]

শুধু গৌরীশঙ্কর নয় বহু ভারতবাসীই এরকম ভূত দেখেছে বহুবার। ভারতবাসীর মনে এ ধারণা বদ্ধমূল রয়েছে বহুযুগ ধরে। ত্রৈলোক্যনাথ সেই বিশ্বাসকেই তুলে ধরেছেন এই গল্পে।

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে হাস্যরস মূলরস এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে বেশীরভাগ গল্পে পাঠককে হাসাতে হাসাতে কিছু নীতিকথা শুনিয়েছেন তিনি। এজন্যই তাঁর গল্প শুধু Fun নয়। আলোচ্য গল্পে গৌরীশঙ্করের নির্মম পরিণতির পেছনে ছিল ধনলোভ, ভূতের মুখ দিয়ে আমরা জানতে পারি সে কথা :

''ধনলোভে বিনা শিক্ষায় চাঁদ ধরতে যাওয়ার মত এ অসীম সাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিল গৌড়ীশঙ্কর। কিন্তু তাঁর পরিণতি হয় মারাত্মক।''[৩৮]

'মুক্তামালা' গল্পগ্রন্থের শেষ গল্প 'মদন ঘোষের বদনে হাসি'। গল্পের প্রথমেই জানতে পারি মনের মত পত্নী লাভ হওয়ার ফলে মদন ঘোষের বদনে হাসি সৃষ্ট হয়েছে। তার স্ত্রীর নাম রাধারাণী। কিন্তু রাধারাণীকে লাভ করা মদনের পক্ষে খুব সহজে সম্ভব হয়নি। রাধারাণীকে লাভ করতে যে জটিল পরিস্থিতির সম্মুক্ষীণ তাকে হতে হয়েছে তার সমাধানে যে অসুবিধার মধ্যে ও সমস্যার মধ্যে তাকে পরতে হয়েছে তা অত্যন্ত সরসভাবে বিবৃত করা হয়েছে এ গল্পে। আর তা করতে গিয়ে উঠে এসেছে তৎকালীন কলকাতার আর্থসামাজিক জীবন, চাষীবৃত্তির প্রতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের ঘৃণার দৃষ্টি। পুরোহিতদের লোভ লালসা, বাসস্থানের অভাবে একই বাড়িতে অনেক পরিবারে ঠাসাঠাসি করে কোনরকমে জীবন যাপনের প্রতিচ্ছবি।

গল্পের শুরুতেই মদন ঘোষ যেভাবে অতি সংক্ষেপে আত্মপরিচয় প্রদান করেছে তা পরিবেশন নৈপুণ্যে কৌতুকাবহ হয়ে উঠেছে :

> '' আমি মদন ঘোষ। আমার বদনে আপনারা হাসি দেখিতেছেন। নতুন আমার বিবাহ হইয়াছে। সেইজন্য আমার মুখে এত হাসি। কিন্ত তা বলিয়া আমি বেপাগল নই। তবে মনের মত পত্নী লাভ হইলে চিত্ত একটু প্রফুল্ল হয়। আমারও তাই হইয়াছে। তাই হাসিমুখে সকলকে আমি সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছি গুড মর্ণিং!''[৩৯]

একথার মধ্যে রয়েছে বিশুদ্ধ কৌতুক। এরকম বিশুদ্ধ কৌতুক এ গল্পের মধ্যে রয়েছে অজস্র। এবং তা সৃষ্টি হয়েছে কখনো উপমা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। আশাতিরিক্ত দক্ষিণাপ্রাপ্তির ফলে পুরোহিতের মন প্রফুল্ল হবে এটাই স্বাভাবিক, এর মধ্যে হাসির কোন ব্যাপার নেই। কিন্তু উপমার যথাযথ প্রয়োগের ফলে এ ঘটনাও হাসির খোরাক হয়ে ওঠে। যেমন মদন ঘোষ বলেছে :

> ''আজ আমার মুখে হাসি দেখিয়া আপনারা কত কি মনে করিতেছেন, কিন্তু সেদিন তাঁহার প্রফুল্ল ডায়ামনকাটা মুখখানি যদি দেখিতেন, তাহা হইলে বলিতেন যে, হ্যাঁ ! হাসি বটে। তাহার কারণ এইযে দক্ষিণাটি কিছু আশাতিরিক্ত হইয়াছিল।''[৪০]

—এখানে উপমার গুণেই হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। 'ডায়ামণ'কাটা' উপমাটি সরিয়ে নিলেই হাস্যরস ক্ষীণ হয়ে পড়ে। শুধু উপমা নয় ত্রৈলোক্যনাথের অন্যান্য গল্পের মত এখানেও রয়েছে কল্পনা। কখনও কল্পনার মধ্য দিয়ে বিস্ময় এবং তা থেকে কৌতুক, আবার কখনও বাস্তবের সমান্তরালে বিপরীত অবস্থা কল্পনার মধ্য দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে এ গল্পে। যেমন ধরা যাক মদন ঘোষের রাক্ষস কল্পনার কথা। যদিও তার একটি প্রেক্ষাপট আছে। মদন ঘোষ জানালার দিকে দাঁড়িয়ে পাল মহাশয়ের জানালার গায়ে গায়ে লেগে থাকা অশ্বত গাছের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেই চমকে উঠল :

''সর্ব্বনাশ। সেই গাছের উপর, নিবিড় শাখা-প্রশাখা ও পত্রের ভিতর হইতে বাহির হইয়া, কি একটা জন্তুর মত সেই স্থূল ডালাটির উপর আসিয়া বসিল। তাহার পর ধীরে ধীরে সেই বৃক্ষ-শাখার উপর দিয়া সে পাল মহাশয়ের দ্বিতীয় ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। একটু দূরে গ্যাসের আলোক ছিল, তাই আমি তাহাকে দেখিতে পাইলাম; নতুবা সেই অন্ধকার রাত্রিতে আমি তাহাকে দেখিতে পাইতাম না। যখন সে আরও অগ্রসর হইল, তখন আমি দেখিলাম যে, সে কোনরূপ জন্তু নহে। তাহার আকৃতি কতকটা মানুষের মত। মানুষের মত বটে; অথচ তাহাকে মানুষ বলিয়া আমার বোধ হইল না। ঘোড়ার মত তাহার মুখ লম্বা ছিল। মুখের বর্ণ সবুজ। বন্য শূকরের ন্যায় বড় বড় দাঁত। যে স্থানে চক্ষু থাকে, তাহার সেই স্থানে গোল গোল দুইটি গর্ত ছিল। শরীরের নিম্নভাগ মানুষের মত ছিল। কিন্তু সে মানুষ নহে, ভূতও নহে। আমি ভাবিলাম যে, যখন ইহার সবুজ কপালের উপর রক্ত চন্দনের দীর্ঘ ফোঁটা রহিয়াছে, তখন এ নিশ্চয়ই রাক্ষস।''[৪১]

—এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে মদন ঘোষ একজন শিক্ষিত চাকুরীজীবী ব্যক্তি। আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না যে তার মত একজন শিক্ষিত ব্যক্তি শিশু কল্পনার মত রাক্ষস খোক্কসে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে কীভাবে। এরকম কল্পনা নিঃসন্দেহে বাস্তব পরিস্থিতির বিপরীত কল্পনা যা নিঃসন্দহে পাঠকের মনে হাস্যরসের উদ্রেক করে।

হাস্যরস সৃষ্টির অন্যতম কৌশল সিচুয়েশন সৃষ্টি। ত্রৈলোক্যনাথ এ বিষয়ে বিশেষভাবেই পারঙ্গম। এ গল্পের মধ্যেও রয়েছে এ রকম কিছু সিচুয়েশন যা হাস্যরসের উদ্রেক করে। যেমন পাল মহাশয়ের বাড়িতে তার পুত্র মিহির চারিদিকে ঘেরাটোপের মধ্যে পরে যখন আতঙ্কিত হয়ে পরে এবং প্রতিবেশী মদন ঘোষের সাহায্য প্রার্থনা করে তখন মদন ঘোষ বলে : ''ঘরে তলোয়ার আছে? থাকে তো দিন, আমি লড়াই করিব।''

ত্রৈলোক্যনাথ সমাজ সচেতন শিল্পী। তাই তাঁর এরকম গল্প একটিও পাওয়া যাবে না যেখানে সমাজ জিজ্ঞাসা নেই। আলোচ্য গল্পটিও এর ব্যতিক্রম নয়। সমাজ সচেতন মানুষ হিসেবে ত্রৈলোক্যনাথ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাগুলিকে আত্মস্থ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন জীবিকার নিরিখে সামাজিক মানুষের ভেদাভেদ। এবং যে কৃষকশ্রেণী আমাদের অন্নদাতা তাদের প্রতি আমাদের অবজ্ঞা। এই অবজ্ঞার চিত্র তুলে ধরেছেন ত্রৈলোক্যনাথ আলোচ্য গল্পে : ''চাষ করিলে মানুষ চাষা হয়, আর চাকুরিতে মানুষ বাবু হয়।... কাহার না ইচ্ছা যে, তাহার ছেলে জেন্টলম্যান হয়?'' ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে চলছে এই জেন্টলম্যান হওয়ার প্রতিযোগিতা। অথচ

ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস করতেন দেশের উন্নতিতে বাবুদের তুলনায় কৃষকদের অবদান ঢের বেশী। তাই তার আক্ষেপ :

> ''লোকের মনে কি কুসংস্কার। যাহাদের পরিশ্রমে ভূমি হইতে মনুষ্যের আহার আচ্ছাদন উৎপাদিত হয়, তাহাদিগকে লোকে চাষা বলিয়া ঘৃণা করে। বড় মানুষের রাজভবন ও গাড়ী ঘোড়া হইতে সামান্য ভিখারীর একমুষ্টি অন্ন পর্যন্ত সমুদয় বস্তু কৃষকের পরিশ্রমেই উৎপন্ন হয়। ভারতের সমুদয় জাতির সম্বল—কৃষিকার্যের ফল। সুতরাং কৃষকেরা সাধারণের পূজ্য, তাহারা ঘৃণিত নহে। এ বিবেচনা যাহাদের নাই, তাহাদিগকে আমি আর কি বলিব!''[৪২]

'মজার গল্প' গ্রন্থের 'সোনা-করা-যাদুগরের গল্প' একটি নীতিমূলক গল্প। মিথ্যেকথা মানুষের জীবনে কি ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে আনে তা দেখানোই লেখকের উদ্দেশ্য। গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে লেখক এখানে উপদেশ দিয়েছেন। লেখক নিজে যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করতেন না। তাই তাদের প্রতি লেখকের বক্তব্য :

> ''তবে যাহারা যাদুগর সাজিয়া বেড়ায়, তাহারা প্রায় অনেকেই জুয়াচোর, ফাঁকি দিয়া লেখকের নিকট প্রতারণা করে, কখনো তাহাদের ভালো হয় না। অসৎ লোকদিগের নিদারুণ কষ্ট ভোগ করতে হয়।''[৪৩]

মিথ্যেবাদী লোকের ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখানোর জন্য বটগারের যে কাহিনি লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা করুণরসের মধ্য দিয়ে এক বেদনাদায়ক পরিণতি ডেকে আনে। প্রুশিয়া রাজ্যে বটগারের জন্ম। একদিন বটগার সকলকে বললেন যে : ''আমি তামাকে সোনা করিবার উপায় করিয়াছি''। কথাটির মধ্যে ছিল চূড়ান্ত ফাঁকি। এই ফাঁকিই তার পরবর্তী জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ক্রমে এই কথা প্রুশিয়া রাজের কানে গিয়ে পৌঁছালো। প্রুশিয়ারাজ তাকে প্রচুর সোনা তৈরী করে দিতে বললে তিনি সাক্ষনী দেশে পলায়ন করলেন। কিন্তু সেখানেও বিপদ; সাক্ষনাধিপতি ব্যাপারটা জেনে গিয়েছেন। তিনি তাকে বন্দী করলেন এবং তার কাছে সোনা বানানোর কৌশল জানতে চাইলেন। তখন অন্য একটি রাজ্যে তিনি পলায়ন করলেন, যদিও শেষ রক্ষা হল না। সাক্ষণরাজ তাকে ধরে ফেললো। এরপর সাক্ষণ দেশে তাকে বন্দি করে রাখা হল। অবশেষে চীনামাটির দ্রব্য যা চীন থেকে আমদানি করা হত, যা ছিল সোনার চেয়েও দামী তা আবিষ্কার করতে বটলার মনোনিবেশ করলেন। দীর্ঘ পরিশ্রমের পর তার এ প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। এতে রাজার প্রচুর লাভ হয়েছিল। কিন্তু তবুও রাজা বটগারকে মুক্তি দিলেন না। বটগারকে রাজা ক্রীতদাসে পরিণত করে রাখলেন। স্বাধীনতার জন্য বহুবার প্রার্থনা করা সত্ত্বেও তাকে মুক্তিদান করা হল না। অবশেষে মন দুঃখে বটগার মদ খেতে আরম্ভ করলেন। কিছুদিন

পরে সুরাপান করার ফলে তার শরীর ভেঙ্গে যায়। মাত্র পয়ত্রিশ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। গল্পের শেষে লেখকের আক্ষেপ : ''জীবনের প্রথম অবস্থায় বটগার যদি মিথ্যে কথা না বলিতেন, তাহা হইলে বোধহয়, তাহার এইরূপ দুর্গতি হইত না।''[৪৪]

'মজার গল্প' গল্পগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ মজা নিঃসন্দেহে 'বিদ্যাধরীর অরুচী' গল্পটি। গল্পটি আগাগোড়া কৌতুকরসে টইটম্বুর। কাজের ঝি বিদ্যাধরীর অরুচীর কথা বলতে গিয়ে লেখক তার সবকিছুতেই অধিকতর রূচির কথাই বলেছেন। কিন্তু কিসে যে বিদ্যাধরীর সত্যিকারের অরুচি তা কেউ জানে না। বিদ্যাধরী গল্পে সারাক্ষণ অরুচির ভান করেছে যদিও তার সহকর্মীদের বিদ্যাধরীর সেই অভিনয় বুঝতে অসুবিধা হয়নি। সবকিছুতেই বিদ্যাধরীর অধিকতর লোভ সকলের কাছে তাকে আলোচনার বস্তু ও ক্ষোভের কারণ করে তুলেছে। এই নিয়ে কেউ কোন বিরূপ মন্তব্য করলে বিদ্যাধরী বলে :

> ''তোমরা সকলতাতেই আমার ছল ধরো। মা আমাকে একটু ভালোবাসেন, তাই সকলে তোমরা ফাটিয়া মরো। আমার অরুচি, মুখে কিছু ভালো লাগে না। চড়াই পাখীর আহার। না খাইয়া যেন দড়ি হইয়া যাইতেছি।''[৪৫]

তার সহকর্মী গোলাপী ঝি, পিতেম, ছিদেম বিদ্যাধরীর এই সমস্ত কথা সহ্য করতে পারেন না। পিতেম এই কথা শুনে বলে

> ''তোমার অরুচী। পাথরটি টইটম্বুর করিয়া ব্রাহ্মণ তোমায় ভাত দেয়, তারপর দুবার-তিনবার তুমি ভাত চাহিয়া লও। এই ত' তোমার অরুচি; এর উপর যদি রুচি থাকিত, তাহা হইলে ঘোড়াশালের ঘোড়া, হাতিশালের হাতি খাইতে।''[৪৬]

ছিদেম বলে :

> ''সকলের কাছে তুমি বল যে তুমি না খাইয়া রোগা হইয়া যাইতেছ। কিন্তু রোজ রোজ তুমি মোটা হইতেছ। তোমার গায়ে মাছি বসিলে, মাছি পিছলাইয়া পড়ে।''[৪৭]

বিদ্যাধরী সকলের কাছে বাক্‌যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাড়ীর কর্তৃদের কাছে অতিরঞ্জিত করে এমন সব কথা বানিয়ে বলে যার ফলে ছিদেম ব্রহ্মণের চাকরি যায়। আর তার জায়গায় বিদ্যাধরীর মনোনীত পুরুষোত্তম চাকরী পায়। এখানেই শেষ নয়। মৃত্যুর পরে তার সম্পত্তির উইল দেবে বলে বিভিন্ন জনকে জানায় এবং সেইসব লোকদের থেকে বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা আদায় করতে থাকে। আর এই ফাঁদে পড়ে বেচারা পুরুষোত্তমের দুর্গতির শেষ থাকে না। পাশাপাশি পিতম ও গোলাপীরও বিরাগভাজন হয় সে। সর্বশান্ত হয়ে সে যখন বুঝতে পারে গোটাটাই বিদ্যাধরীর প্রতারণা তখন সে বিদ্যাধরীকে জব্দ করতে চায়। কিন্তু পিতম ও গোলাপীর চক্রান্তে সে নিজেই জব্দ হয়। এই জব্দ হওয়ার দৃশ্য লেখক যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা সত্যিই

কৌতুকাবহ। বস্তাবন্দী করে গিন্নীকে বিদ্যাধরী ভেবে বেঁধে নিয়ে এসে যখন সে তা বুঝতে পারে তখন পুরুষোত্তম হতভম্ব হয়ে যায়। এরপর সেখান থেকে সে পলায়ন করে। এরপর তার আর কোন হদিশ কেউ পায়নি। গল্পটিতে আগাগোড়া কৌতুকরস থাকলেও পুরুষোত্তমের জন্য পাঠকের মনে একটু সহানুভূতিও সঞ্চারিত হয়।

'একঠেঙো ছকু' গল্পটি কথকথার ঢঙে রচিত হয়েছে। কিনুবাবু, বদন, নবদ্বীপ প্রভৃতি আড্ডাধারী বন্ধুদের সামনে একঠেঙো ছকু মহাষ্টমীর দিন সন্ধ্যায় তার একঠেঙো হওয়ার কাহিনি বিবৃত করতে গিয়ে যে গল্প করেছে তা অবিশ্বাস্য। অবশ্য লেখক নিজেও এটাকে অবিশ্বাস্য বলে মনে করেন। আর সেজন্য তিনি 'মাঝে মাঝে', 'দৈবক্রমে', 'ভাগ্যক্রমে' শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন এবং সর্বোপরি পুরো গল্পটিকে hypnotism-এর পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। 'একঠেঙো ছকু' গল্পটির মূল রস দুঃখজনক হলেও হাস্যরস যে একেবারে সৃষ্টি হয়নি তা নয়। কিনুর সুরাকে 'অতি পবিত্র সামগ্রী', 'দ্রবীভুত তারা' বলার মধ্যে, দাতওয়ালা ভূতের সঙ্গে ছকুর কথোপকথনের মধ্যে, করাত দিয়ে ডাক্তারের ডান পা কাটার মধ্যে, ছকুর উদ্ধার করা যকের টাকা খরচ করতে গিয়ে জালনোট হিসেবে ধরা পড়ার মধ্যে রয়েছে হাস্যরসের অফুরন্ত ভান্ডার।

ত্রৈলোক্যনাথের প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি 'ডমরুচরিত' গল্পগ্রন্থ। ত্রৈলোক্যনাথ জীবিত অবস্থায় গ্রন্থটির প্রকাশ দেখে যেতে পারেননি। কারণ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, আর ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যু হয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে। সাত পর্যায়ে সমাপ্ত এই গল্পমালা ত্রৈলোক্যনাথের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিস্তৃত দলিল। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলিতে যে রূপকথাধর্মী আজগুবিরস, বৈঠকী মেজাজ, কৌতুককর ঘটনার সমাবেশ রয়েছে তার সর্বাত্মক প্রয়োগ ঘটেছে 'ডমরুচরিতের' গল্পগুলিতে। সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে ডমরুচরিত'কে Cerventes-এর ''Don Quxiote``-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

'ডমরুচরিত' গল্প গ্রন্থেই আমরা পরিচয় পাই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় চরিত্র ডমরুধরের। পরবর্তীকালে যে ঘনাদা (প্রেমেন্দ্র মিত্রের সৃষ্টি), টেনিদা (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃষ্টি) বাংলা সাহিত্যের পাঠকের মন জয় করে নিয়েছে তার কুলপুরোহিত বলা যায় ডমরুধরকে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই ডমরুধরকে পৃথিবীর ব্যঙ্গ সাহিত্যে এক অপূর্ব সৃষ্টি আখ্যা দিয়ে তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

> ''তাহার উদ্ভট গল্পের ভিতর দিয়া তাহার চরিত্রের যে রূপ অপূর্ব বিকাশ হইয়াছে তাহাই আমাদিগকে বেশী আকৃষ্ট করে। গল্পরসের সহিত চারিত্রিক পরিচয় মিশ্রিত হইয়া পরস্পরের উপভোগ্যতা বাড়াইয়াছে। এই সমস্ত অসম্ভব-কল্পনা-প্রসূত

আখ্যানের মুকুরে ডমরুচরিত্র উহার সমস্ত বীভৎসতা, আত্মপ্রসাদ, কূটবুদ্ধি ও ভক্তি অভিনয় লইয়া আশ্চর্য সুসঙ্গতির সহিত প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ডমরুধর পৃথিবীর ব্যঙ্গ সাহিত্যে একটি অপূর্ব সৃষ্টি। তাহার সমস্ত দুষ্ক্রিয়াসক্তি ও ঘোরতর নীচ স্বার্থপরতা সত্ত্বেও তাহার সপ্রতিভতা, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও আপনার সম্বন্ধে নিঃসংকোচ সত্যভাষণের জন্য সে আমাদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় না। ফলষ্টাফের দৈহিক স্থূলতা তাহার সমস্ত ফাঁকি-জুয়াচুরি, মিথ্যা আত্মশ্লাঘা ও নিরঙ্কুশ রসিকতার নির্ভরযোগ্য আধার রচনা করিয়াছে। সেরূপ ডমরুধরের ঘোর কৃষ্ণকান্ত দেহ ও আত্মগর্বস্ফীত, ইতরমন তাহার সমুদয় কৌতুককর দুরবস্থা ও কল্পনার অনিয়ন্ত্রিত ভ্রমণবিলাসকে এক স্বাভাবিক আশ্রয়ের বৃন্তে ধরিয়া রাখিয়াছে।''[৪৮]

সমালোচক শিশিরকুমার দাশ ভাঁড়ু দত্ত, হীরা বা ঠকচাচার তুলনায় চরিত্র সৃষ্টি হিসেবে ডমরুধরকে এগিয়ে রেখেছেন। তিনি ত্রৈলোক্যনাথেরই আরেক সৃষ্টি নয়নচাঁদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন :

''ভাঁড়ু দত্ত, হীরা বা ঠকচাঁচা যে শ্রেণিতে বিরাজিত নয়নচাঁদ তাদেরই সমগোত্রীয় কিন্তু ডমরুধরের কোন তুলনা নেই। কারণ তার প্রতিভা বহুমুখী।''[৪৯ক]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন :

''রচনার মুন্‌শীয়ানার দিক থেকে 'ডমরুচরিতের' উৎকর্ষ 'কঙ্কাবতীর' চাইতেও বেশি। এই বইটিতে ত্রৈলোক্যনাথের প্রতিভা তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। লেখকের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য এদের রঙে রসে সমুজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। কাহিনির অপূর্বতার সঙ্গে রঙ্গ-কৌতুকের সমাবেশ এবং ভাষার বহুতা-স্বাচ্ছন্দ্য বইটিকে সর্বাঙ্গীণভাবে পরম উপভোগ করে তুলেছে।''[৪৯খ]

ডমরুধর 'ডমরুচরিত' গল্প সিরিজের কথক। লেখক ডমরুধরের যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে দেখা যায় কলকাতার দক্ষিণে একটি গ্রামে তার বাস। প্রথম বয়সে তিনি নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত কৌশলে লোক ঠকিয়ে সেই দুরবস্থা কাটিয়ে তিনি প্রভুত ধনশালী হয়েছেন। ডমরুধর নিজেকে মা দুর্গার আশীর্বাদপুষ্ট বলে দাবী করেন এবং বিপদে পড়লে দেবী দুর্গাই তাকে রক্ষা করেন। ডমরুধর উদ্ভট কল্পনা, অতিলৌকিকতা প্রভৃতির মিশ্রণে একধরণের আজগুবি গল্প বলার কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। প্রতিবছর পূজোর সময় ডমরুধর তার দালানে বসে লম্বোদর, গজানন, হলধর, শঙ্কর ঘোষদের নানারকম গল্প শোনান। অদ্ভূত গল্প বলার কৌশলেই তাদেরকে ঘন্টার পর ঘন্টা মুগ্ধ শ্রোতার মত বসিয়ে রাখতে পারেন। শ্রোতা বন্ধুরা এ সমস্ত আজগুবি জেনেও কখন যেন নিজেদের অজান্তে এই গল্পগুলিকে বিশ্বাস করে ফেলে। আর

এই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে কখনো যমরাজের সঙ্গে ডমরুধরের সাক্ষাৎ হয়, কখনো বাঘের ছাল পড়ে জ্যান্ত বাঘে রূপান্তরিত হন তিনি। কখনো একদিনে আড়াই হাজার মশা মারেন, কখনো ভুতের হাতে কামড় বসিয়ে দেন, কখনো মাছভাজা খাইয়ে ভূতকে বশ করেন, কখনো অশ্বাণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করেন, কখনো ব্যাঘ্রের উদরে প্রবেশ করেন, আবার সেখান থেকে চিঠিও লেখেন।

ডমরুধর চেহারার দিক থেকে মোটেও সুপুরুষ নন। তাহার দেহের বর্ণটি ঠিক যেন ''দময়ন্তীর পোড়াশোউল মাছ', 'দাঁত একটিও নাই, মাথার মাঝখানে টাক, তাহার চারিদিকে চুল, তাহাতে একগাছিও কাঁচা চুল নেই, মুখে ঠোঁটের দুই পাশে সাদা সাদা সব কি হইয়াছে।''[৫০] ডমরুধরের চেহারা আরও সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন পিং মহাশয় :

> ''আহা, মহাশয়ের কী রূপ। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, তাহার ভিতর হইতে খড়ি মাটির আভা বাহির হইতেছে। তাহা দেখিয়া আমার উস্কোখুস্কো পালক আবৃত কাক ভূষন্ডীকে মনে হইল। বহুকালের প্রাচীন ছেৎলাপড়া বাঁশের ঝড়ার ন্যায় মহাশয়ের অস্থি-পিঞ্জর দেখা যাইতেছে। দধিপুচ্ছ শৃগালের পর্বত-গহ্বরের ন্যায় আপনার দন্তশূন্য মুখগহ্বর। তাহার দুইধারে কি দুইটি কাক বসিয়াছিল? ঐ যে ঠোঁটের দুইকোণে শুভ্রবর্ণের কি রহিয়াছে? আপনার টোল-পড়া গাল দুইটি দেখিয়া হনুমানের চড়-প্রহারিত রাবন-মাতুল কালনেমির গন্ডদেশ আমার স্মরণ হইল। পক্কচুল-পরিবেষ্টিত মস্তকের মধ্যস্থিত বিস্তৃত টাক দেখিয়া আমার মনে হইল, বিধাতা বুঝি পূর্ণচন্দ্রটিকে বসাইয়া তাহার চারিদিকে শুভ্রবর্ণের মেঘ গাঁথিয়া দিয়াছেন।''[৫১]

তা সত্ত্বেও রসবোধ তাঁর কম নেই। বয়স পয়ষট্টি হলেও রমনীতে তার আসক্তি কমেনি। ঐ বয়সে তিনি তৃতীয়বার বিবাহ করেছেন। শুধু তাই নয় তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দুর্লভী বাগ্‌দীর সঙ্গে প্রেমের জন্য তার মন আনচান করে ওঠে। এখানেই শেষ নয়, দুর্লভীর বোনঝি চঞ্চলাও তার হাত থেকে পরিত্রাণ পায়নি। চঞ্চলার গ্রাম বহুদূরে হলেও মাঝে মাঝেই সেখানে হানা দিতেন তিনি এবং চঞ্চলার দাওয়ায় বসে তিনি তার সঙ্গে গল্প করতেন। অবশ্য এসব করতে গিয়ে বারবার বহু বিপদের হাতে ডমরুধরকে পড়তে হয়েছে। কখনো কন্যার পিতার কাছে বিশাল সম্পত্তির মিথ্যা গল্প ফাঁদতে হয়েছে, কখনো মোহর চুরি করতে হয়েছে, কখনো দুর্লভ বাগ্‌দির ঘরে গ্রামবাসীদের দ্বারা বহুক্ষণ আটকে থাকতে হয়েছে।

ডমরুধর চরিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য হল কৃপণতা। তিনি অত্যন্ত কৃপন ও হিসেবি। অত্যন্ত বৈষয়িক বলেই একটি পয়সাও কখনো খরচ করেন না। লোক পাছে অলস হয়ে পরে সেই অজুহাতে ভিখারীকে কখনো মুষ্টিভিক্ষা পর্যন্ত করেন না। তিনি বুঝেছিলেন যে, ''টাকা উপার্জন

করিলেই টাকা থাকে না; টাকা খরচ না করিলেই টাকা থাকে।''[৫২] তাই দুই হাতে প্রচুর টাকা উপার্জন করলেও টাকা খরচের ব্যাপারে অধিক মাত্রায় সচেতন তিনি। নিজের বাড়ির দুর্গোৎসবটি পর্যন্ত তিনি কেবল প্রতিমা, ঢোল ও গঙ্গাজল দিয়ে সারেন। এ বিষয়ে কেউ কোন প্রশ্ন করলে বিষয়টিকে মায়ের আজ্ঞা বলে তিনি চালিয়ে দেন। খরচের ভয়ে পুজোর কয়দিন নিজের বাড়িতে রান্না সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়ে লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে কাটিয়ে দেন। এমনই বিচিত্র স্বভাবের চরিত্র ডমরুধরের। তবে একটি ক্ষেত্রে ডমরুধর কৃপন নন, সেটি হল মামলা মোকদ্দমার ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে প্রচুর ব্যয় করতে তার বিন্দুমাত্র বাঁধে না।

ডমরুধরের শঠতা, স্বভাবলোলুপতা, অর্থোপার্জনের জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বনে সংকোচহীনতা পাঠককে বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। লোভের বশবর্তী হয়ে ডমরুধর দুর্গা পূজা করেন। এবং আবাদের প্রজাগণকে নিমন্ত্রণ করে তাদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করেন। সত্যিকথা বলতে তাঁর পূজা করার একমাত্র উদ্দেশ্যই লোকের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করা। লম্বোদরের এক প্রশ্নের উত্তরে ডমরুধর নিজেই একথা স্বীকার করেছে :

> ''লম্বোদর উত্তর করিলেন—''বিলক্ষণ বুঝিয়াছি, কিন্তু এ পূজা তোমার না করিলে কি নয়?''
>
> —মুখ কুঞ্চিত করিয়া নাকি সুরে ডমরুধর উত্তর করিলেন,—''তুমি তো বলিলে! কিন্তু পূজা যদি না করি, তাহা হইলে লোকের কাছ হইতে প্রণামীটি কি করিয়া আদায় করি?''[৫৩]

লোভের বশবর্তী হয়েই তিনি এক সন্ন্যাসীকে দুগ্ধবতী গাভীর ন্যায় পুষে রেখেছিলেন।
অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির লোক এই ডমরুধর। এই গুণটির জন্যই নানা অভিযোগে অভিযুক্ত ডমরুধরের শাস্তি হয় না। বারবার নানা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে তিনি নিজেকে বাচাতে পারেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরের লোক ঠকানোর অদ্ভুত কৌশল তিনি ধরে ফেলেন অবলীলায় :

> ''সন্ন্যাসী ঠাকুর। আমি কিন্তু বোকা নই। এরূপ বুজরুকির কথা আমি অনেক শুনিয়াছি। গৃহস্থের বাড়ী গিয়া দুই-একটি টাকা অথবা নোট ডবল করিয়া তোমরা গৃহস্বামীর বিশ্বাস উৎপাদন কর। তোমাদের কুহকে পড়িয়া গৃহস্বামী ঘরের সমুদয় টাকা -কড়ি গহনাপত্র আনিয়া দেয়। হাঁড়ি অথবা বাক্সের ভেতর সেগুলি বন্ধ করিয়া তোমরা পূজা কর। পূজা সমাপ্ত করিয়া সাতদিন কি আটদিন পরে গৃহস্বামীকে খুলিয়া দেখিতে বল। সেই অবসরে তোমরা চম্পট দাও। সাত-আট দিন পরে গৃহস্বামী খুলিয়া দেখে যে, হাঁড়ি ঢন্ ঢন্। বাজিকরের ও চালাকি আমার কাছে খাটিবে না।''[৫৪]

অথচ ডমরুধর নিজে স্বদেশী কোম্পানী খুলে প্রচুর লোক ঠকান, টাকা শোধের জন্য হ্যান্ডনোট লিখতে লিখতে ভাবেন : ''যত পার হ্যান্ডনোট লিখিয়া লও। উপুড়হস্ত কখনো আমি করিব না। নালিশ করিবে? ডিক্রি করিবে? ডিক্রি ধুইয়া খাইও। কি বেচিয়া লইবে বাপু?''[৫৫] এরকমভাবে ডমরুধর কত লোককে যে ঠকিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। একমাত্র ঠকাতে পারেননি তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী এলোকেশীকে। একমাত্র এলোকেশীর কাছেই সে অসহায়। এলোকেশীর ভয় তাকে বারবার তাড়া করেছে। জিনের এক প্রস্তাবের প্ররিপ্রেক্ষিতে ডমরুধরের বক্তব্যে সেই আতঙ্কই প্রকাশ পেয়েছে :

> ''... এলোকেশীর মত না লইয়া আমি যাইতে পারিব না। কারণ, তাঁহাকে যদি না বলিয়া যাই, তাহা হইলে পৃথিবী খুঁজিয়া তিনি আমাকে বাহির করিবেন। আর মাথার টাক হইতে পায়ের অঙ্গুলি পর্যন্ত তিনি আমাকে ঝাঁটা-পেটা করিবেন।''[৫৬]

ধূর্তচূড়ামণি ডমরুধরের এখানেই ট্র্যাজেডি।

ডমরুধর চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল নিজ কৃতকর্মের অকপট স্বীকারোক্তি করার ক্ষমতা। ডমরুধর নিজের কর্ম সম্পর্কে যথেষ্টই সচেতন। মিথ্যা ভাষণে তার জুড়ি নেই। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোন পাপ কাজ অবলীলায় করতে পারেন তিনি। কিন্তু তাই বলে সেগুলিকে গোপন করার প্রচেষ্টা তার মধ্যে দেখা যায় না। তিনি অবলীলায় বলে যান নিজের মোহর চুরির কথা, সম্পত্তির মিথ্যা গল্প শুনিয়ে বিয়ে করার কথা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ। যেমন স্বদেশী কোম্পানী খুলে সমুদয় টাকা পয়সা কীভাবে আত্মসাৎ করেছিলেন তিনি সে গল্প বলতে গিয়ে ডমরুধরের অকপট স্বীকারোক্তি :

> ''অনেকগুলি টাকা লোকে দিয়াছিল। বলাবাহুল্য যে, সে টাকাগুলি সমুদয় আমি লইলাম। শঙ্কর ঘোষ ভাগ চাহিল। আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, —''হিসাবের বহি তুমি নিজে হাতে প্রস্তুত করিয়াছ। তাহাতে তুমি লিখিয়াছ যে, লোকসান হইয়াছে। কোম্পানি ফেল হইয়া গিয়াছে। টাকা আর কোথা হইতে আসিবে। বরং যাহা লোকসান হইয়াছে, তাহা আমাকে দিয়া যাও।''[৫৭]

নিজের খারাপ কাজটিকে খারাপ বলে তার কখনো মনে হয় না। বরং সেই কাজের জন্য তিনি গর্ববোধ করেন।

আসলে ডমরুধর এক অদ্ভুত জীবনদর্শনে বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বাস করেন, 'টাকায় কি না হয়?'[৫৮] সবসময় তিনি ভাবেন :

> ''যেমন করিয়া পারি, আমি ধনবান হইব, টাকা হইলে কেহ তখন জিজ্ঞাসা করে না যে, অমুক কি করিয়া সম্পত্তিশালী হইয়াছে। জাল করিয়া হউক, চুরি করিয়া হউক,

যেমন করিয়া লোক বড় মানুষ হউক না কেন, অমুকের টাকা আছে, এই কথা শুনিলেই ইতর-ভদ্র সকলেই গিয়া তাহার পদলেহন করে, সকলেই তাহার পায়ে তৈল মর্দন করে। রও একবার আমার টাকা হউক, তখন দেখিবে যে, তুমি বাছাধন আমার বাড়িতে ফ্যান চাটিতে যাও কিনা।''[৫৯]

ডমরুধর প্রমাণ ছাড়া কোন কথা বলেন না।..

হাস্যরসিক ত্রৈলোক্যনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয় নিহিত রয়েছে 'ডমরুচরিত' গল্প গ্রন্থে। এই গল্পগ্রন্থের প্রতিটি গল্পই ডমরুধরের জীবনের সঙ্গে যুক্ত। গল্পগুলির মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক আচার অনুষ্টানের  গলদের প্রতি যেমন ব্যঙ্গ রয়েছে তেমনি চিরন্তন বাংলাদেশের সার্বজনীন পূজার্চনা, ভন্ড স্বদেশীয়ানা ও শিক্ষাব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি রয়েছে তীব্র কটাক্ষ। অবশ্য সাধারণ কৌতুকও সেখানে দুর্লভ নয়। ব্যঙ্গকৌতুকের সঙ্গে অদ্ভূত বা উদ্ভটরস মিলেমিশে একটি বিচিত্র স্বাদের সৃষ্টি করেছে ডমরুচরিতের গল্পগুলি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের কল্যাণ সাধনের মানসিকতা। এই ডমরুচরিতের গল্পগুলি নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যমূলক রচনা। তাই ত্রৈলোক্যনাথ নিজেই পাঠকের উদ্দেশে বলেছেন :

''ডমরুচরিত প'ড়রে ভাই ক'রে একান্ত ভক্তি।
ইহকালে পাবে সুখ পরকালে মুক্তি।।
..
পয়সা দিয়া ডমরুচরিত কিনে রাখ ঘরে।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ পাবে ইহার বরে।।''[৬০]

'ডমরুচরিত'-এর গল্পগুলির প্রধান স্থান জুড়ে রয়েছে আজগুবি রস। এই আজগুবি রসের অবতারণার মধ্য দিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ পাঠকের সামনে খুলে দিয়েছেন এক কল্পরাজ্যের জগৎ। মানুষের কথা বলতে গিয়ে সমস্যা যেখানে জটিল আকার ধারণ করেছে তখনই লেখক যুক্তির অতীত জগতে গিয়ে সমস্যার সমাধান করেছেন। তাই বলে সেই যুক্তিহীন জগৎ পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে না বরং পাঠক এক নির্ভেজাল কৌতুক অনুভব করে। যেমন ডমরুধরের বলা সন্ন্যাসী সংকটের গল্পটি। সন্ন্যাসীর মন্ত্রবলে ডমরুর শরীরে সন্ন্যাসীর প্রবেশ ঘটেছে। আর সন্ন্যাসীর জীর্ণ অন্ধ শরীরে প্রবেশ ঘটেছে ডমরুর। ডমরুর শরীরে প্রবেশ করে সন্ন্যাসী ডমরুর গৃহে অতি বিলাস ব্যাসনে জীবন অতিবাহিত করেছে, এমনকি ডমরুর নির্বাচিত তৃতীয় পক্ষের কন্যাকে মহাসমারোহের সঙ্গে বিবাহ করার আয়োজন করেছে। ডমরুর টাকায় গ্রামশুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। আর ডমরুধরের অবস্থা তার নিজের কথাতে :

''আর উপায় কি? আমি নীরব হইয়া বসিয়া রহিলাম। সন্ন্যাসীর দুজন চেলা আসিয়া আমার দুইহাত ধরিয়া লইয়া চলিল। অন্ধ দুইটি চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল। বিদী গোয়ালিনীর চালাঘরে আমাকে লইয়া গেল। সে রাত্রী মাটির উপর পড়িয়া কাঁদিয়া কাটাইলাম। পরদিন প্রত্যুষে চেলা দুইজন আমার দুই পায়ে দড়ি বাঁধিয়া আমগাছের ডালে ঝুলাইয়া দিল। একঘন্টাকাল আধোমুখে আমি ঝুলিতে লাগিলাম। সে যে কি যাতনা, তাহা আর তোমাদিগকে কি বলিব। অন্ধ, তা না হইলে চক্ষু দুইটি ঘোর রক্ত বর্ণে রঞ্জিত হইত। সন্ন্যাসীর গায়ের বর্ণও কালো ছিল, তা না হইলে মুখ লাল হইয়া যাইত। ঘোর কষ্ট।''[৬১]

এই অবস্থা থেকে ডমরুধর তার উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে কীভাবে পরিত্রাণ পেয়েছিল তা যথেষ্ট কৌতুককর।

সূক্ষ্ম শরীরের ডমরুধর মনের দুঃখে হাজির হলেন সুন্দরবনে এবং প্রাণপণে মা জগদম্বার কৃপা প্রার্থনা করতে লাগলেন। জগদম্বার কৃপায় হঠাৎ একটি প্রকান্ড ব্যাঘ্র কাঠুরিয়াদের আক্রমণ করল। একজনকে সে ভূতলশায়ী করে থাবা দিয়ে তাকে সে পিঠে তুলতে চেষ্টা করল। বাঘের দীর্ঘ লাঙ্গুলটি পিছনের একটি গাছ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। একজন কাঠুরিয়া উপস্থিত বুদ্ধি বলে সেই লেজটিকে গাছের সঙ্গে পাক দিয়ে লেজের আগাটি টেনে ধরলো। এই ঘটনার জন্য বাঘ প্রস্তুত ছিল না :

''বাঘের মনে ভয় হইল। বাঘ মনে করিল, —মানুষ ধরিয়া মানুষ খাইয়া বড় হইলাম। আমার লেজ লইয়া কখনো টানাটানি করে নাই। আজ বাপধন! তোমাদের একি নতুন কান্ড। পলায়ন করিতে বাঘ চেষ্টা করিল। একবার, দুইবার, তিনবার বিষম বল প্রকাশ করিয়া বাঘ পলাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু গাছে লেজের পাক, বাঘ পলাইতে পারিল না।... প্রাণের দায়ে ঘোরতর বলে বাঘ শেষকালে যেমন এক হ্যাঁচকা টান মারিল, আর চামড়া হইতে তাহার আস্ত শরীরটা বাহির হইয়া পড়িল।...মাংসের বাঘ রুদ্ধশ্বাসে বনে পলায়ন করিল।''[৬২]

সূক্ষ্ম শরীরের ডমরুধর এতক্ষণ গোটা ঘটনাই প্রত্যক্ষ করছিলেন। বাঘশূন্য ব্যাঘ্রচর্ম সেই স্থানে পড়ে থাকতে দেখে তিনি হঠাৎ করে সেই বাঘ-ছালের ভিতর প্রবেশ করলেন। ব্যাঘ্রচর্মের ভিতর সূক্ষ্মশরীর প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র ছালটা সজীব হয়ে উঠল। এখন ডমরুধর হলেন বাঘের শরীরের ডমরুধর। এদিকে সন্ন্যাসী ডমরুর বেশে বিবাহ করতে চলেছেন। ব্যাঘ্ররূপী ডমরুধর বিবাহ সভার নিকটে গিয়ে উপস্থিত হইলেন। ডমরুধর বলেছেন :

''তাহার পর লম্ফ দিয়া একবারে আমি বরের চারি ঘোড়ার গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। ঘোর ত্রাসে সন্ন্যাসীর হৃৎকম্প হইল। আমার শরীর হইতে ফট করিয়া সে সূক্ষ্ম শরীর বাহির করিল। আপনার সূক্ষ্ম শরীর লইয়া কোথায় সে পলায়ন করিল, তাহা বলিতে পারি না।''[৬৩]

—এরকম মজার মজার ঘটনায় গল্পটি পরিপূর্ণ।

এই ধরণের আরেকটি গল্প 'কুম্ভীর বিভ্রাট'। ডমরুধর এখানে যে কুমীরের গল্প শুনিয়েছেন সে কুমীর :

''গন্ধমাদন পর্বতে কালনিমের পুকুরে যে কুম্ভীর হনুমানকে ধরিয়াছিল, ইহা তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক, গঙ্গা দেবী যে মকরের পিঠে বসিয়া বায়ু সেবন করেন, সে মকরকে এ কুমীর একগালে খাইতে পারে।...ইহার দেহ বৃহৎ, তালগাছের ন্যায় বড়, ইহার উদর এই দালানটির মত, অন্যান্য কুমীর জীবজন্তুকে ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করে।''[৬৪]

ডমরুধরের আবাদে হঠাৎ এই কুমীরের আবির্ভাবে আবাদের লোক অস্থির হয়ে পড়ল। আস্ত গরু, আস্ত মহিষ সে গিলে খেয়ে নিত। রাত্রিতে সে লোকের ঘরে ও গোয়ালে সিঁদ দিয়ে মানুষ ও গরুবাছুর টেনে নিত। একদিন ডমরুধরের চোখের সামনে একটি নৌকা ডুবিয়ে তাহার আরোহীদেরকে একে একে গিলে ফেলল। তার মধ্যে একজন আরোহীর সর্বাঙ্গ বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত ছিল। ডমরুধরের মাথায় এই চিন্তা উদয় হল :

''চিরকাল আমি কপালে পুরুষ। যদি এই কুমীরটাকে আমি মারিতে পারি তা হইলে ইহার পেট চিরিয়া এই গহনাগুলি বাহির করিব। অন্তত: পাঁচ ছয় হাজার টাকা আমার লাভ হইবে।''[৬৫]

—যেমন ভাবনা তেমন কাজ। ডমরুধর কুমীরটিকে বধ করার জন্য জিনিসপত্র জোগার করতে কলকাতায় গমন করলেন। ফিরে এসে শুনলেন যে কুমীর আরেকটি মানুষ খেয়েছে। এক সাঁওতালনী এক ঝুড়ি বেগুন মাথায় নিয়ে হাটে যাওয়ার সময় কুমীর তাকে আস্ত গিলে ফেলেছে। এরপর যেভাবে কুমীরটিকে বধ করা হয়েছে সে দৃশ্য সত্যিই রোমাঞ্চকর। তবে তার থেকেও আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে কুমীরটিকে বধ করে করাত দিয়ে তার পিঠ চেরার পর। ডমরুধরের কথায় :

''বলিব কি ভাই, আর দুঃখের কথা, কুমীরের পেটের ভিতর দেখি না যে সেই সাঁওতালী মাগী চারদিন পূর্বে কুমীর যাহাকে আস্ত ভক্ষণ করিয়াছিল সেই মাগী পূর্বদেশীয় সেই ভদ্রমহিলার সমুদয় গহনাগুলি আপনার সর্বাঙ্গে পড়িয়াছে। তাহার পর

নিজের বেগুনের ঝুরিটি সে উপুড় করিয়াছে। সে বেগুনগুলি সম্মুখে জঁই করিয়া রাখিয়াছে। ঝুড়ির উপর বসিয়া মাগী বেগুন বেঁচিতেছে।''[৬৬]

শঙ্কর ঘোষ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

''কুমীরের পেটের ভিতর ঝুড়ির উপর বসিয়া সে বেগুন বেঁচিতেছিল?''

ডমরুধর বললিলেন—''হ্যাঁ ভাই, কুমীরের পেটের ভিতর সেই ঝুড়ির উপর বসিয়া মাগী বেগুন বেঁচিতেছিল।''[৬৭]

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন—''কাহাকে সে বেগুন বেঁচিতেছিল? কুমীরের পেটের ভিতর সে খরিদ্দার পাইল কোথা?''[৬৮]

বিরক্ত হইয়া ডমরুধর বলিলেন—''তোমার এক কথা, কাহাকে সে বেগুন বেঁচিতেছিল সে খোঁজ করিবার আমার সময় ছিল না।''[৬৯]

'ডমরুচরিতে'র চতুর্থ গল্পে ডমরুধর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে মা দুর্গার কাছে বরপ্রাপ্ত হলেন। ডমরুধর মায়ের কাছে কার্ত্তিকের ময়ূরে চড়ে আকাশ ভ্রমণ করার বর প্রার্থনা করলেন। আকাশ ভ্রমণ করে ফেরার সময় হু হু শব্দে ময়ূর পৃথিবীর দিকে ধাবিত হল। অসংখ্য ব্রহ্মান্ড, অসংখ্য গ্রহ ও নক্ষত্র পার হয়ে তিনি ক্রমাগত নীচের দিকে নামতে লাগলেন। অবশেষে সূর্যমন্ডল পার হলেন। ময়ূরের দুই পাশে ডমরুধরের পা দুটি ঝুলছিল। এই সময় ডমরুধর বর্ণনা করছেন :

''হঠাৎ কোথা হইতে কি একটা আসিয়া আমার বাম পায়ে কামড় মারিল। কিন্তু তৎক্ষনাৎ ছাড়িয়া দিল। চকিত হইয়া আমি সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম যে, অতি বিরক্তিসূচক মুখ ভঙ্গিমা করিয়া চাকার ন্যায় কি একটা গড়াইয়া গেল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, চাকার ন্যায় ওটা কি? আমার পায়ে কামড় মারিল কেন? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে বুঝিতে পারিলাম না। আমার রূপে জগৎ আলো করিয়া শূন্য পথে আমি আসিতেছিলাম। চাকার ন্যায় ওটা রাহু। আমাকে পূর্ণিমার চন্দ্র মনে করিয়া সে গ্রহণ লাগাইতে আসিয়াছিল।''[৭০]

এখানেই শেষ নয়, এরপর পর্বতপ্রমাণ একটি বাঘের মুখ থেকে ডমরুধর যেভাবে বেঁচে ফিরেছেন সে কাহিনিও যথেষ্ট কৌতুককর। বাঘ ডমরুধরকে গিলে ফেলা সত্ত্বেও ডমরুধর মরেনি। বরং এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুক্ষীন হয়েছে সে :

''ব্যাঘ্রের পেটের ভিতর ঘোর অন্ধকার। আমি বিরস বদনে তাহার এককোণে গিয়া বসিলাম। ভাবিতে লাগিলাম,—এখন করি কি? আর রক্ষা নাই। এখনি হজম হইয়া

যাইব। আমার চিহ্নমাত্র থাকিবে না। দুই চারিদিন পরে এক ছটাক মল হইয়া বাহির হইব।''[৭১]

এরকম ভাবতে ভাবতে তার মনে পড়ল যে তার পকেটে কাগজে মোড়া খানিকটা সোডা আছে। সেই সোডা উত্তমরূপে তিনি গায়ে মেখে বসে রইলেন। এরফলে বাঘের পেটের অন্যান্য খাদ্যবস্তু হজম হলেও ডমরুধর একই রকম থাকলেন। কিন্তু সমস্যার তো পুরোপুরি সমাধান হল না। কেননা দীর্ঘদিন বাঘের পেটে থেকে বাঁচা যায় না। তাই পকেট থেকে কাগজ পেন্সিল বার করে ডমরুধর তার কর্মচারীকে চিঠি লিখলেন। কর্মচারীটি বুদ্ধিমান লোক। তিনি অত্যন্ত কৌশলে ডমরুধরকে বাঘের পেট থেকে বার করে আনেন।

'চঞ্চলার গাইগরু' গল্পটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'ডমরুচরিতের' পঞ্চম গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদে গল্পের নামকরণ করেছেন লেখক 'চঞ্চলার গাইগরু'। এ গল্পে লেখক এক অদ্ভূত রকমের উদ্ভটরস পরিবেশন করেছেন যা আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। চঞ্চলা হলেন দুর্লভী বাগদীর বোনঝি। আমরা জানি ঘরে তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী এলোকেশী থাকা সত্ত্বেও ডমরু দুর্লভ বাগদীর প্রতি যথেষ্ট দুর্বল ছিলেন। একবার দুর্লভী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে চঞ্চলা তার সেবা শুশ্রূষার জন্য দুর্লভীর কাছে আসে। সেখানেই চঞ্চলার সঙ্গে পরিচয় হয় ডমরুধরের। এরপর দুর্লভী বাগদীর শরীর সুস্থ হয়ে উঠলে চঞ্চলা পাঁচক্রোশ দূরে নিজের গ্রামে চলে যায়। কিন্তু চঞ্চলার সঙ্গে সদ্ভাব করার জন্য ডমরুধরের মন অস্থির হয়ে পরে। বয়স পয়ষট্টি হলেও নারীর প্রতি মোহ ডমরুধরের এতটুকু কমেনি। তাই মাঝে মাঝেই তিনি চঞ্চলার গ্রামে যেতেন। একদিন চঞ্চলার গ্রামে তিনি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার মধ্যে পড়েছিলেন। চঞ্চলার গ্রমে তিনি পৌঁছে দেখলেন যে চঞ্চলার পিতা সহদেব চঞ্চলার গাইগরুর দড়ি ধরে বড় রাস্তার উপর দিয়ে মাঠে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যমনষ্ক হয়ে কথোপকথন করতে করতে তারা যখন হাঁটছিলেন তখন সহসা পিছন থেকে একটি মোটর গাড়ী এসে তাকে ডমরুধরকে সজোরে ধাক্কা মারল। এই ঘটনায় ডমরুর কোমর পর্যন্ত কেটে দুখানা হয়ে গেল। দুটি কাটা পা গাড়ীর চাকায় আটকে গেলেও ধড়টি রাস্তায় পড়ে কাটা ছাগলের মত ছটফট করতে লাগলো। যদিও এ অবস্থাতেও ডমরুধরের প্রাণ সম্পূর্ণ বের হয়ে যায়নি। এ ঘটনায় শুধু ডমরুই নয় গাই গরুটিরও দেহ দ্বিখন্ডিত হয়ে গেল। যদিও তার শরীরের নিম্নাংশ গাড়ীর চাকায় আটকে যায়নি। সুতরাং একদিকে গরুর ধর ও অপরদিকে ডমরুধরের কোমর ও পা রাস্তার উপর পড়েছিল। এমন সময় সেই পথ দিয়ে ব্যাগ হাতে নিয়ে যাচ্ছিলেন ভিক্ষু ডাক্তার। এই দৃশ্য দেখে তিনি দৌড়ে এলেন। এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে যখন তিনি ডমরুর কোমর ও পা দেখতে পেলেন না তখন সেই গরুর কোমর ও পা ডমরুর শরীরে তিনি জুড়ে দিলেন। ভিক্ষু ডাক্তারের ওষুধের গুণে সেই গরুর কোমর ও পা

ডমরুর শরীরে জুড়ে গেল। সে যাত্রায় বেঁচে গেলেন ডমরুধর। কিন্তু বিপত্তি দেখা দিল এই উদ্ভট প্রাণীটির অধিকার নিয়ে। ভিক্ষু ডাক্তার বললেন :

> ''ডমরুবাবু তুমি আমার পাওনা টাকা দাও নাই। আমাকে ফাঁকি দিয়াছিলে। কিন্তু এখন তোমার সেই শরীরটি আমার হল। গরুর কোমর তোমার শরীরে যদি আমি না জুড়িয়া দিতাম তাহা হইলে এতক্ষণ কোন কালে তুমি মরিয়া যাইতে। দুইদিন পড়ে তোমার ধড়টি পচিয়া যাইত। অথবা পুড়িয়া ছাই হইত। অতএব তোমার এই শরীরটি এখন আমার। আমার চাষ আছে। যতদিন বাঁচিবে ততদিন আমার ক্ষেত্রে তোমায় কাজ করিতে হইবে।''[৭২]

চঞ্চলার পিতা সহদেবও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি ভিক্ষু ডাক্তারের হাত থেকে দড়ি কেড়ে নিয়ে বললেন :

> ''ভালরে ভাল ইনি তোমার? সে কিরূপ কথা? ইহার আধখানা চঞ্চলার গাই। এখনও ইহার দুধ হইবে। আমরা ইহাকে ছাড়িয়া দিব না।''[৭৩]

—শেষে গ্রামবাসীদের মধ্যস্থতায় সমস্যার সমাধান হল। ঠিক হল দিনের বেলা ডমরুধরকে ভিক্ষু ডাক্তারের কাছে থাকতে হবে। সেখানে সমস্ত দিন তিনি ডমরুধরকে খাটিয়ে নেবেন। আর রাত্রিবেলা তাকে চঞ্চলার গোয়ালে বাঁধা থাকতে হবে। প্রাতঃকালে চঞ্চলা দুধ দুইয়ে ভিক্ষু ডাক্তারের বাড়িতে তাকে পাঠিয়ে দেবে। একবেলা ভিক্ষু ডাক্তার তাকে খেতে দেবে আর অন্যবেলা তাকে খেতে দেবে সহদেব বাগ্‌দী। বহুকষ্টে এরকমভাবে ডমরুধরের একমাস কাটলো। ডমরুধর তখন এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য মা দুর্গার স্মরণাপন্ন হলেন। ডমরুধর প্রতিটি বিপদের সময় মা দুর্গা যেমনভাবে তাকে উদ্ধার করেন এবারও মা তাকে বিপদ থেকে মুক্ত করার আস্বাস দিলেন। পরদিন সকালে শঙ্কর ঘোষ তার টাকা ফাঁকি দেওয়ার জন্য ডমরুধরকে পুলিশে দেওয়ার উদ্যোগ করল এবং তার ডান হাত ধরে টানতে লাগল। এ সংবাদ চাপা রইল না। ভিক্ষু ডাক্তার দৌড়ে এসে বললেন : ''ধড়টি আমি রক্ষা করিয়াছি। এ ধড় আমার সম্পত্তি।''[৭৪] তিনি তার বাম হাত ধরে টানতে লাগলেন। চঞ্চলা বলল : ''ইহার নীচের দিকটা আমার। আমার গাইগরু।''[৭৫] এই টানাটানিতে সঙ্কট যখন চরমে ততক্ষণে সেখানে হাজির হলেন ডমরুধরের স্ত্রী এলোকেশী। উগ্রমূর্তী ধারন করে পালকি থেকে তিনি নেমে এসে বললেন : ''ইনি আমার স্বামী। তোমরা ছাড়িয়া দাও। ইঁহাকে আমি বাড়ি লইয়া যাইব। বাড়ি গিয়া ঝাটাপেটা করিয়া ইহার ভূত তাড়াইব।''[৭৬] এই বলে সে ডমরুধরের পিছনের দিকের বামপায়ের ক্ষুর ধরে টানতে লাগল। অবশেষে তাদের প্রবল টানাটানিতে ডমরুধরের শরীর থেকে ফস করে চঞ্চলার গাইগরুর কোমর ও পা খসে আলাদা হয়ে গেল। ডমরুধর অজ্ঞান হয়ে পড়ে

রইলেন। ''এরপর যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন তিনি দেখলেন এক অদ্ভূত দৃশ্য। তিনি চেয়ে দেখলেন নিজের ঘরে তিনি শুয়ে আছেন। পায়ের দিকে চেয়ে দেখলেন এগুলো তারই পা, গরুর নয়। শরীরের দিকে চেয়ে দেখলেন যে তার নাদুস-নুদুস নধর শরীর যেমন ছিল, তেমনই রয়েছে। মনে মনে ভাবলেন : ''সকলই জগদম্বার মায়া। সমুদয় মায়ের লীলা।''[৭৭]

—এ রকম উদ্ভট কল্পনার জগতে পাঠককে নিয়ে যাওয়া ত্রৈলোক্যনাথের পক্ষেই সম্ভব। বাংলা সাহিত্যে এ কৃতিত্ব আর কোন লেখকের নেই।

শুধু আজগুবিরস নয় ডমরুচরিতের গল্পগুলিতে ব্যঙ্গরসের শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথের উপস্থিতিও চোখে পড়ার মত। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় 'স্বদেশী কোম্পানী' গল্পটির কথা। ত্রৈলোক্যনাথ এ গল্পে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে ব্যঙ্গ করেছেন। ত্রৈলোক্যনাথের প্রতিভার একটি বড় স্মারকচিহ্ন এই গল্পটি। কী সূক্ষ্মভাবে তিনি দেশের রাজনীতির অসাড়ত্বের দিকগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন তা দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

'স্বদেশী কোম্পানী' গল্পে যে স্বদেশী কোম্পানীর পরিকল্পনা করেছেন ডমরুধর সে ধরণের কোম্পানী ভারতবর্ষের পক্ষে ঐতিহাসিক সত্য ছিল। ১৯০৫ সালে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা শুরু হয়, গড়ে ওঠে বিভিন্ন স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে ভারতীয় প্রচেষ্টায় ঔষধ নির্মাণের কারখানা 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' স্থাপিত হয়। জামসেদ জি টাটা প্রতিষ্ঠা করেন দেশীয় লোহার কারখানা। দেশে বহু সাবান, দেশলাইয়ের কারখানা, চিনি ও গুড়ের শিল্প ও স্বদেশী ব্যঙ্ক, জীবন বীমা স্থাপিত হয়। হয়তো অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের কোম্পানী খুলতে গিয়ে লোকসানের মুখ দেখতে হত উদ্যোক্তাদের। তবু তারা পিছিয়ে আসেনি। কেননা স্বদেশী আন্দোলনের মহৎ উদ্দেশ্য তাদের অন্তরে নিহিত ছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু একধরণের মানুষ থাকে যারা মহৎ কর্মযজ্ঞের আড়ালে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত থাকে। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও এক ধরণের লোক ছিল যারা আন্দোলনের নামে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি ছাড়া কিছুই করতে পারেনি। তাই সুযোগ পেলেই এ সমস্ত নেতাদের কটাক্ষ করতে ছাড়েননি ত্রৈলোক্যনাথ। ত্রৈলোক্যনাথের 'স্বদেশী কোম্পানী' গল্পটির মধ্যেও এ ধরণের কটাক্ষ রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যেমন জাতীয় রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন এবং কিছু নেতার স্বার্থপরতা, ভন্ডামি, কপটতাকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ত্রৈলোক্যনাথের জীবনে সেরকম কোন

ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু সাধারণভাবে তিনি কোনরকম ভন্ডামিকেই সহ্য করতে পারতেন না। তাই ভন্ডামি এবং কপটতাকে সুযোগ পেলেই ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত করেছেন।

'স্বদেশী কোম্পানী' গল্পে ডমরুধর শঙ্কর ঘোষকে নিয়ে খুলেছিল 'গ্র্যান্ড স্বদেশী কোম্পানী'। ডমরুধর এমনই এক ব্যক্তি যিনি স্বদেশী কোম্পানী বলতে ব্যবসাকেই বোঝেন। এর আগেও দু-দুবার কোম্পানী খুলে লোক ঠকিয়ে প্রচুর টাকাপয়সা আত্মসাৎ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। এবারেও ডমরুধর প্রচুর টাকাপয়সা আত্মসাৎ করতে চান। একাজে তাঁর যোগ্য সঙ্গী শঙ্কর ঘোষ। তিনি কলকাতার তাবড় তাবড় ধনি ব্যক্তিদের শেয়ার হোল্ডার করে নিয়েছিলেন। কলকাতার ধনী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সভা ডাকা হয়েছিল। সেখানে ডমরুধররা বড় বড় বক্তৃতা করেছিলেন। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল : ''যে ব্যক্তি একশত টাকার শেয়ার বা অংশ কিনবে প্রতিমাসে লাভ স্বরূপ তাহাকে পঁচিশ টাকা প্রদান করা হইবে।''[৭৮] এরকম বিজ্ঞাপন দেখে ও বক্তৃতায় ভুলে বহু ধনী ব্যক্তি মোটা টাকায় শেয়ার কিনেছিল এবং ডমরুধর ও শঙ্কর ঘোষের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছিল।

বহুলোক শেয়ার কেনায় প্রচুর টাকা জমা পরল তাদের ফান্ডে। ডমরুধর হলেন কোষাধ্যক্ষ। কয়েকমাস পেরিয়ে গেল কিন্তু একটিও কাগজ প্রস্তুত হল না। লভ্যাংশ দূরে থাক আসল টাকাও কেউ ফেরৎ পেল না। কয়েকজন নালিশ করল, মোকদ্দমাও হল, কিন্তু কোম্পানী লিমিটেড হওয়ায় কারোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হল না। শঙ্কর ঘোষ একটা জাল হিসাবের খাতা বের করলেন। সেখানে তিনি দেখালেন যে কোম্পানীর লোকসান হয়েছে। তবে শঙ্কর ঘোষ এত করেও একটিও পয়সা লাভ করতে পারলেন না। সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করলেন ডমরুধর। শঙ্কর ঘোষ ভাগ চাইতে গেলে ডমরুধর তাকে স্পষ্ট জানালো যে :

> ''হিসাবের বই তুমি নিজে হাতে প্রস্তুত করিয়াছ। তাহাতে তুমি লিখিয়াছ যে লোকসান হইয়াছে। কোম্পানী ফেল হইয়া গিয়াছে। টাকা আর কোথা হইতে আসিবে। বরং যাহা লোকসান হইয়াছে তাহা আমাকে দিয়া দাও।''[৭৯]

আলোচ্য গল্পে স্বদেশী মোহগ্রস্ত বাঙ্গালীকে রসিকতার মধ্য দিয়ে কটাক্ষ করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ। এটেল মাটি থেকে কাগজ প্রস্তুতের গল্প শুনে ধূর্ত ডমরুধর খুব সহজেই এ কাজের ভন্ডামি ধরে ফেলেন এবং মনে মনে হাসেন আর ভাবেন : ''এ কাজ হালাগুলো বাঙ্গালীর উপযুক্ত বটে।''[৮০] তৎকালীন শিক্ষিত মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিকেও তিনি কটাক্ষ করেছেন এ গল্পে। তারা যখন নির্দ্বিধায় এটেল মাটি থেকে কাগজ তৈরীর প্রস্তাব মেনে নেয় তখন তাদের জ্ঞানবুদ্ধি সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলে পারা যায় না।

স্বদেশী আন্দোলন অধিকাংশ বাঙ্গালীর কাছে ছিল একটা হুজুগ। এ আন্দোলনের মর্মার্থ তাদের কাছে বোধগম্য হয়নি। এই স্বদেশীমোহগ্রস্থ হুজুগে বাঙ্গালীদের নির্বুদ্ধিতাকে তিনি অত্যন্ত রসিকতার সুরে ব্যঙ্গ করেছেন:

''দেশে দেশে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল, সকলে বলিতে লাগিল যে আর আমাদের ভাবনা নাই। যখন এঁটেল মাটি হইতে কাগজ প্রস্তুত হইবে তখন বালি হইতে কাপড় হইবে। বিদেশ থেকে আর কোন দ্রব্য আমাদের আর আমদানি করিতে হইবে না। দেশ টাকায় পূর্ণ হইয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া কলিকাতার বাঙ্গালীরা একদিন সন্ধ্যাবেলা আপন আপন ঘর আলোকমালায় আলোকিত করিল।''[৮১]

স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবর্গের বাক্‌সর্বস্বতাকেও ডমরুধর লক্ষ করেছেন। তাদের প্রতিও ত্রৈলোক্যনাথের বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হয়েছে :

''সেই যাহারা ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন, যাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া স্কুল কলেজের ছোড়াগুলি আনন্দে হাততালি দিয়া গগন ফাটাইয়া দেয়, আমরা সেইরূপ দুইজন বক্তা জোগাড় করিয়াছিলাম। তাহারা ইজের দিয়া কোমর আঁটিয়া রাখেন।''[৮২]

'ভিক্ষু ডাক্তার' গল্পে ঊনবিংশ শতাব্দীর কুসংস্কারে জর্জরিত ভারতবর্ষের চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি ত্রৈলোক্যনাথের তির্যক দৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথই সর্বপ্রথম চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিদ্যাকে কমেডির প্রধান বিষয়বস্তু করে গল্প লিখেছিলেন। এই গল্পে যে ডাক্তারের কথা বলা হয়েছে সেই ভিক্ষু ডাক্তারেরা এখনও ভারতবর্ষ থেকে নির্মূল হয়নি। এখনো অনেক গ্রামে গঞ্জে চলেছে এদের রমরমা। ঊনবিংশ শতকে এরা যে ভারতবর্ষের বুকে দাপিয়ে বেড়িয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এরা আদতে ডাক্তারই নয়। ডিগ্রিলাভ তো দূরের কথা ডাক্তারী সম্পর্কে কোনরকম সাধারণ জ্ঞানও এদের নেই। ভিক্ষু ডাক্তার এরকমই একজন ডাক্তার। তাঁর সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তাতে:

''ভিক্ষু কলিকাতার কোন ডাক্তারখানায় ছয়মাস কম্পাউন্ডারি করিয়াছিলেন। একবার কোন রোগীকে কৃমির ঔষধের পরিবর্তে কুচিলা বিষ প্রদান করিয়া ছিলেন। রোগীর তাহাতে মৃত্যু হইয়াছিল। সেজন্য ভিক্ষুর ছয়মাস কারাবাস হইয়াছিল। এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ভিক্ষু এখন স্বগ্রামে আসিয়া ডাক্তার হইয়াছেন।''[৮৩]

ভিক্ষু নিজের বিদ্যার পরিচয় দিতে গিয়ে যে গল্প শুনিয়েছেন তার বীভৎসতা প্রণিধানযোগ্য :

''নেহালা গ্রামের ত্রিলোচন সরকেলের পেট ক্রমে ক্রমে ফুলিতে লাগিল। পেট ফুলিয়া ক্রমে জালার মত হইল। কত ডাক্তার কত বৈদ্য আসিল। কেহ বলিল উদরী,

কেহ বলিল টিউমার। কত ঔষধ তিনি খাইলেন কিছুতে কিছু হইল না। অবশেষে তাঁহার লোকেরা আমাকে লইয়া গেল। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার পেটটি দেখিলাম। অবশেষে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের ঘরে মাছ ধরিবার সুতা বড়শী আছে? তাহারা সুতা-বড়শী আনিয়া দিল। বঁড়শীতে হোমিওপ্যাথিক গুলির টোপ করিয়া সুতা সহিত রোগীকে গিলিতে বলিলাম। মুখের বাহিরে সুতাটির অপর দিক ধরিয়া আমি একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সুতা যেই একটু নড়িয়া উঠিল আর সেই সময় আমি টান মারিলাম। বলিব কি মহাশয়? ধামার মত প্রকান্ড একটা কচ্ছপ তাহার পেট হইতে আমি বাহির করিলাম। জলের সহিত সামান্য শিশু কচ্ছপ সরকেল মহাশয় ভক্ষণ করিয়া ছিলেন। উদরে সেই কচ্ছপ ক্রমে বড় হইয়া তাহার জীবন সংশয় করিয়াছিল। আমার চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হইলেন।''[৮৪]

ভিক্ষু হোমিওপ্যাথি ডাক্তার তাই হোমিওপ্যাথির গুণগান তাকে অবশ্যই করতে হবে। অবশ্য এটাও তিনি জানাতে ভোলেন না যে সবার হাতে এর সঠিক প্রয়োগ হয় না। এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে গেলে দরকার অভিজ্ঞতা। ভিক্ষু ডাক্তারের সে অভিজ্ঞতা রয়েছে। তার দাবি :

''রোগীর চেহারা দেখিলেই আমি ঔষধ ধরিতে পারি। আমার হাতে একটিও রোগী মারা পড়ে না। সেজন্য কলাকাতার হোমরা চোমরা ডাক্তারগন যাঁহারা ষোল টাকা বত্রিশ টাকা ভিজিট গ্রহণ করেন তাঁহারা বলেন ঝিঝিরডাঙ্গার ভিক্ষু ডাক্তারকে লইয়া এস তিনি না হইলে এ রোগের ঔষধ কেহ ঠিক করিতে পারিবে না। সেজন্য মাঝে মাঝে আমাকে কলিকাতায় যাইতে হয়।''[৮৫]

ডমরুধরের বুকে প্যাঁচ গল্পেও চিকিৎসকদের অদ্ভূত ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হয়েছে। ডমরুধর জানিয়েছেন :

''ডাক্তার আসিয়া আমার নাড়ি দেখিলেন, পেট টিপিয়া দেখিলেন, বুকের উপর বামহস্ত রাখিয়া দক্ষিন হস্তের অঙ্গুলির ডগা দিয়া অনেক ঠোকাঠুকি করিলেন। তাহার পর আমার বুকে চোঙ্ বসাইলেন। চোঙের অন্য দিকে কান দিয়া তিনি বলিলেন, ''এখানে একটা প্যাঁচ আছে। এইরূপ তিন চারিটা প্যাঁচের কথা তিনি বলিলেন, প্যাঁচ আছে শুনিয়া আমার মনে ভরসা হইল। আমি ভাবিলাম যে আমার যখন এতগুলি প্যাঁচ আছে তখন আমি মরিব না, বহুকাল বাঁচিব।''[৮৬]

গ্রন্থকারেরা আমাদের কাছে চিরকালই শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তারাই যখন কপটতার আশ্রয় নেন তখন তা হয়ে ওঠে বিদ্রূপের বিষয়। ত্রৈলোক্যনাথের সজাগ দৃষ্টি এক্ষেত্রেও পড়েছিল। সমাজ সংসারের আর পাঁচটা ক্ষেত্রের মত এখানেও সততার অভাব ত্রৈলোক্যনাথকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। এসমস্ত গ্রন্থকার, অনেকেই প্রতিভার জোর যতটা তার থেকেও অনেক বেশী টাকার জোড়ে বড় গ্রন্থকার হয়েছেন। 'জিলেট মন্ত্র' গল্পে লম্বোদর ও ডমরুধরের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আমরা এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারি। 'জিলেট মন্ত্র' গল্পে ডমরুধর লম্বোদরকে জিজ্ঞেস করেছেন:

> '''মেঘনাদবধ' কে লিখিয়াছেন জান? লম্বোদর উত্তর করিলেন—''কেন? মাইকেল মধুসূদন দত্ত।'' ডমরুধর বলিলেন—''হ্যাঁ সকলের তাই বিশ্বাস কিন্তু কলিকাতায় যখন আমি চাকরী করিতাম তখন সন্ধ্যার পর সাহেবী পোষাক পরিয়া কে আমার নিকট আসিত? দুই ঘন্টাকাল আমি যাহা বলিতাম কে তাহা লিখিয়া লইত? সে লোকটি অপর কেহ নয় সে লোকটি মাইকেল মদুসূদন দত্ত। 'মেঘনাদবধ' কাব্য আগাগোড়া আমার দ্বারা রচিত কিন্তু মাইকেল আমাকে অধিক টাকা দিতে পারিতেন না, টাকা দিতেন বঙ্কিম। কোনদিন পাঁচ, কোনদিন দশ। যেদিন 'দুর্গেশ নন্দিনী' শেষ করিয়া তাঁহার হাতে দিলাম সেদিন তিনি আমাকে একেবারে একশত টাকা দিয়াছিলেন। অন্যান্য পুস্তকের জন্যও তিনি আমাকে অনেক টাকা দিয়াছিলেন। মাইকেল ও বঙ্কিম অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ''মহাশয় আপনি যে আমাদের পুস্তক লিখিয়া দিয়াছেন আমরা বাঁচিয়া থাকিতে সে কথা প্রকাশ করিবেন না। সেইজন্য এতদিন চুপ করিয়া ছিলাম। আর দেখ এখন যতবড় গ্রন্থকার জীবিত আছেন অন্ততঃ সাধারণে যাহাদিগকে গ্রন্থকার বলিয়া জানে, তাহাদের সমুদয় পুস্তকের প্রণেতা এই শর্মা। হাসি পায়, নাম করিব না। নাম করিলে তাহাদের মানসম্ভ্রম একেবারে যাইবে। অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া নাম করিতে তাঁহারা আমাকে মানা করিয়াছেন। সেই জন্য এতদিন চুপ করিয়া আছি। কিন্তু তাঁহারা যে গ্রন্থকার বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দেন, তাই আমার হাসি পায়।''...''[৮৭]

'ঢাক মহাশয়' গল্পে হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠানকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালনের নামে পৈশাচিকতা, বীভৎসতা, নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতাকে করুণরসে সিক্ত করে চূড়ান্তভাবে আক্রমণ করেছেন লেখক। গল্পটিকে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ হিউমারধর্মী গল্প বলা যেতে পারে। এই গল্পটির বিষয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বিদায় আরতি' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় :

‘‘ উড়িয়ে লুচি আড়াই দিস্তে দেড়কুড়ি আম সহ
একাদশীর বিধানদাতা করেন একাদশী,
মুখোরোচক এঁর উপবাস,—দমেও ভারী,—অহো-
পুণ্য ততই বাড়ে যতই এলান্ ভুঁড়ির কশি।
ওদিকে ওই ক্ষীণ মেয়েটি নিত্য কাহার-
একাদশীর বিধান পালন করছে প্রাণে মরে,
কণ্ঠাতে প্রাণ ধুঁকছে চোখে সর্ষে ফুলের সারি,
তৃষ্ণাতে জিভ অসাড় মালা জপছে ঠাকুর ঘরে।
অবাক্ চোখে বিশ্ব দ্যাখে হায় গো বিশ্বনাথ,
দোরোখা এই বিধান পরে হয়না বজ্রপাত?
নিষ্ঠাবানের সধবাও করেন একাদশী
পতির পাতে প্রচুরভাবে আটকে বেঁধে রেখে
আওটা দুধে চুমুক লাগান পিছন ফিরে বসি
পতিদাতা পতিগুরু পাছে ফেলেন দেখে।
বিড়াল চাটে দুধের বাটি বাড়িয়ে দিয়ে গলা
পিঁপড়ে মাছি আমের খোলায় উল্লাসে ভিড় করে,
যাদের ভয় দেখিয়ে করিয়েছে নির্জলা
তারাই শুধু হাতের চেটো মেলছে মেঝের পরে
তৃষ্ণাতে জিভ টানছে পেটে এমনি রোদের তাত
খসখসে দুই চোখের পাতা, হয় না অশ্রুপাত। [৮৮]

—নারীর উপর সমাজনেতাদের সুদীর্ঘকালের অত্যাচারের এই চিত্র আরও মর্মান্তিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ‘ঢাকমহাশয়’ গল্পে। হিন্দু বিধবা নারীকে একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাসে একাকী ঘরে বন্ধ রেখে কীভাবে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হত তার একটি সকরুণ চিত্র তুলে ধরেছেন ত্রৈলোক্যনাথ ডমরুধরের গল্পকথনে :

‘‘জ্বরে কুন্তলার কাঠ ফাটিতেছে। আগুনের ন্যায় শরীরের উত্তাপ হইয়াছে। ক্রমাগত এ-পাশ ও-পাশ করিতেছে। মা একটু জল দাও, ক্রমাগত এই কথা বলিতেছে। মা! পিপাসায় আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। একটু জল দাও মা! একটুখানি দাও। কেবল মুখটি ভিজাইয়া দাও। একটু জল না খাইয়া আর থাকিতে পারি না। জল, জল, জল।

বিরস বদনে মা নিকটে বসিয়া আছেন। মা মাঝে মাঝে বাতাস করিতেছেন। মাঝে মাঝে চক্ষুর জল মুছিতেছেন।

ঢাক মহাশয় আমাকে চুপি চুপি বলিতেছেন, —'' আজ একাদশী। বিধবা। সেজন্য জল দিতে বারণ করিয়াছি। কিন্তু জল দিতে আমার গৃহিণীর ইচ্ছা। এখন করি কি? সেইজন্য তোমাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলাম।

নীচে গিয়া আমি বলিলাম,—বাপ রে! জল কি দিতে পারা যায়? ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। একাদশীর দিন জল খাইতে দিলে তাহার ধর্মটি একেবারে লোপ হইয়া যাইবে!''

ঢাকমহাশয় তাহাই করিলেন। কন্যাকে জল দিলেন না। রাত্রিতে কন্যা পাছে নিজে জল চুরি করিয়া খায়, অথবা তাহার কষ্ট দেখিয়া মাতা, ভগিনী কি অপর কেহ পাছে তাহাকে জল প্রদান করে, সেজন্য সন্ধ্যার সময় কুন্তলাকে তিনি নীচের তলার এক ঘরে বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া দিলেন। সমস্ত রাত্রি পীড়িতা কন্যা একেলা সেই ঘরে রহিল। ধর্ম রক্ষা সম্বন্ধে ঢাকমহাশয়ের এমনি দৃঢ়পণ।

প্রাত:কালে যখন তিনি ঘরের চাবি খুলিলেন, তখন সকলে দেখিল যে বালিকা পিপাসায় হতজ্ঞান হইয়া ঘরের ভিজা মেঝের একধার হইতে অপর ধার পর্যন্ত সমস্ত রাত্রি বারবার চাটিয়াছে। অবশেষে অজ্ঞান হইয়া ঘরের এক কোণে পড়িয়া আছে। মাতা তাহার মুখে জল দিলেন, কিন্তু সে গিলিতে পারিল না। দুই কশ দিয়া জল বাহিরে আসিয়া পড়িল। সে আর কথা কহিল না। শেষকালে একবার মাত্র বলিল,— ''জল জল।'' এই কথা বলিয়া সে প্রাণ ত্যাগ করিল।''...''[৮৯]

এরকম বীভৎস ঘটনার কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। অথচ এরকম পাশবিক ঘটনা ভারতীয় সমাজের খুব স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবেই পরিগণিত হত। ত্রৈলোক্যনাথ হিন্দুসমাজের এই নির্মম প্রথাকে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যঙ্গ করেছেন 'ঢাক মহাশয়' গল্পে।

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলি পাঠ করার পর বারবার একথা মনে হয় যে এগুলি সত্যিই ছোটগল্প তো! কেননা আদি-অন্ত-মধ্য সম্বলিত যে আধুনিক ছোটগল্প অথবা আধুনিক ব্যঞ্জনামুখ্য ঐকসংকটাশ্রয়ী যে ছোটগল্প তা তিনি লেখেননি। তিনি গল্প বলার ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যকেই আশ্রয় করেছেন। বেছে নিয়েছেন বাঙ্গালীর গল্প বলার প্রাচীন বৈঠকীয় রীতি। বিহার করেছেন বাস্তবের বহু উর্ধ্বে ফ্যানটাসির জগতে। যে জগতে যুক্তিশৃঙ্খলা মেনে চলার কোন বাধ্যবাধকতা নেই, বাস্তবের মাটিতে বসে সাপের ল্যাজে পা দিলেও ছোবল খাবার ভয় নেই। অচেনা পরিবেশ হলেও এখানে কোন অজানা আশঙ্কায় মন কেঁপে ওঠে না, এ জগৎ শুধুই

বিস্ময়ের। তবে এ জগৎ Lewis Carroll-এর ''Alice's Adventures in Wonderland``-এর শিশুদের বিস্ময়ের জগৎ নয়। ত্রৈলোক্যনাথ গল্প বলেছেন। সে গল্প বলার একমাত্র উদ্দেশ্য সমাজবীক্ষণ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাই যথার্থই বলেছেন :

> ''কোন শান্তস্রোতা নদীর ধারে, বিরাট কোন ন্যাগ্রোধ ছায়ায় আজিনাসীন বিষ্ণুপনা যেভাবে গল্পের পর গল্পের জাল বুনে গেছেন। মধুখ-বর্তিকার আলোয় কুটির প্রাঙ্গণে বসে যে-ভাবে ভূর্জপত্র পুঁথি থেকে গল্প শুনিয়েছেন সোমদেব—ত্রৈলোক্যনাথের পদ্ধতিও তাই। খেজুর বনের কর্কশ-পত্র মর্মরে, সন্ধ্যাবিকীর্ণ আরব মরুভূমির পটভূমিতে কিউমিস্ আর গড়গড়ার আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে আলিবাবা আর চল্লিশ দস্যুর যে গল্প শুনেছেন বার্টন; 'ভ্যালি অব্ দি কিংসে'র মমির নিশ্বাসতপ্ত মরুবাতাসে তারার রহস্যপ্রদীপ্ত পিরামিডের মহিমচ্ছায়ায়, যাযাবরী তাঁবুতে 'সিন্দবাদ নাবিকে'র যে অপরূপ কাহিনীমালা রচিত হয়ে উঠেছে—ত্রৈলোক্যনাথ তারই অনুবর্তী। তাই সেই বিশিষ্ট 'Oriental` মনোভঙ্গীতে তাঁর গল্প শ্লথগতি, বিলম্বিত ছন্দ, সম্ভব-অসম্ভবের জগতে স্বেচ্ছাবিহারী।
>
> শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথের একটি চোখে আলাদীনের প্রদীপের মায়াকজ্জ্বল, আর একটি চোখে সজাগ সমাজবীক্ষা। তাঁর গল্প সাহিত্য এই দুইয়েরই যৌগিক রূপ। আর এই আশ্চর্য কথা-সাহিত্যকে আরো উপাদেয় করে তুলেছে তাঁর মৌখিক বিবৃতির মতো সহজ অন্তরঙ্গ কথনকৌশল—মুহূর্তের মধ্যে যা পাঠককে ত্রৈলোক্যনাথের আসরে মুগ্ধ শ্রোতার আসনে বসিয়ে দেয়।''[৯০]

আসলে ত্রৈলোক্যনাথের সমসাময়িক যুগে জাতির উন্নতির জন্য ভারতবাসীর সবচাইতে বড় প্রয়োজন ছিল আত্মসংশোধন। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর গল্পে ভারতবাসীর আত্মসংশোধনের ক্ষেত্রগুলিকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেছেন রূপকের। রূপকের আবরণে ভারতবাসীর চরিত্র নিয়ে রঙ্গ-ব্যঙ্গ করেছেন। কৌতুকরসের তুফান তুলে জাতির অন্তরে যে নিগূঢ় মর্মস্পর্শী বেদনা লুকিয়ে আছে তার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এরফলে তাঁর গল্পগুলি কৌতুকরসের গল্প হয়েও শেষ পর্যন্ত করুণরসের গল্প হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্পে fun যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে wit-এর উজ্জ্বল উপস্থিতি। রূপকের আবরণ ভেদ করলে সে wit যেমন উপভোগ্য হয় তেমনি তা বিদ্রূপপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন তা একই সঙ্গে হয়ে ওঠে wit ও satire-এর নিদর্শন। যেমন একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে 'লুল্লু' গল্প থেকে। এখানে ব্রাহ্মণ ভূতকে উদ্দেশ্য করে বলেছে :

''হে ভূত! আশ্রিত সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ আজ পুনরায় তোমার নিকট আসিয়াছে। তোমার কৃপায় তাহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। তোমার কৃপায় তাহার দরিদ্রতা মোচন হইয়াছে। পৃথিবীতে যত ভূত আছে, সকল ভূতের তুমি শ্রেষ্ঠ। ভূতের তুমি রাজা। কৃপা করিয়া দেখা দাও, আর একবার আবির্ভাব হও।''[৯১]

—এখানে ভূত কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে হবে। যেখানেই অন্ধকার সেখানেই ভূত। এই অন্ধকার আসলে ভারতবর্ষের বুকে জমে থাকা নানা কুসংস্কার। এই কুংস্কার আছে বলেই ব্রাহ্মণদের দুঃখমোচন হয়। অর্থাৎ এ কুসংস্কার তাদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ, বেঁচে থাকার সহায়। এ সত্যকথাটি ত্রৈলোক্যনাথের বুঝতে অসুবিধে হয়নি। এই ভূতের স্বরূপ তিনি নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন :

''...যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, অন্ধকার জমিয়া তেমনি ভূত হয়। জল জমাইয়া বরফ করিবার কল আছে, অন্ধকার জমাইয়া ভূত করিবার কল কি সাহেবরা করিতে পারেন না? অন্ধকারের অভাব নাই। নিশাকালে বাহিরে তো অল্প-স্বল্প অন্ধকার থাকেই। তারপর মানুষের মনের ভিতর যে কত অন্ধকার আছে, তাহার সীমা নাই, অন্ত নাই। কোদাল দিয়া কাটিয়া কাটিয়া ঝুড়ি পূরিয়া এই অন্ধকার কলে ফেলিলেই প্রচুর পরিমাণে ভূত প্রস্তুত হইতে পারিবে। তাহা হইলে ভূত খুব শস্তা হয়। এক পয়সা, দুই পয়সা, বড় জোর চারি পয়সা করিয়া ভূতের সের হয়। শস্তা হইলে গরীব-দুঃখী সকলেই যার যেমন ক্ষমতা ভূত কিনিতে পারে।''[৯২]

—আর গরীব-দুঃখীরা ভূত কিনতে সমর্থ হলে তাদেরও আর দুঃখ থাকে না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে ভূতদের উপর সমস্ত অধিকার কেবল ধনীদেরই একচেটিয়া। ভূত তাদের কাছে গরীব-দুঃখীদের শোষণের যন্ত্র। আর এই যন্ত্রের সাহায্যে তারা গরীব দুঃখীদের দিনের পর দিন শোষণ করে চলে। ত্রৈলোক্যনাথ হাস্যরস সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শোষক শ্রেণীর প্রতি বিদ্রূপবাণ যেমন নিক্ষেপ করেছেন তেমনি করুণাবাণ বর্ষণ করেছেন শোষিত মানুষের প্রতি। ত্রৈলোক্যনাথের অন্তর ছিল সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর মন কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল বলেই তাদের দু:খ দুর্দশার মর্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কণ করতে পেরেছেন তিনি। মানুষের প্রতি গভীর দরদ না থাকলে 'ঢাক মহাশয়ে'র মতো মর্মস্পর্শী গল্প লেখা যায় না। মানুষ যে অপরের প্রতি কত নিষ্ঠুর হতে পারে তার চিত্র তুলে ধরেছেন 'মুক্তামালা'র 'গুরুদেব' গল্পে। এমন নিষ্ঠুর গল্প বাংলা সাহিত্যে খুব কম লেখা হয়েছে। এ গল্পগুলিতে ব্যঙ্গ আছে, বিদ্রূপের কষাঘাত আছে কিন্তু এদের সকলকে অতিক্রম করে বড় হয়ে উঠেছে ত্রৈলোক্যনাথের

মানবতাবোধ। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম হাস্যরসকে মানবতাবোধের সঙ্গে মিশিয়ে পরিবেশন করতে পেরেছেন। যথার্থ অর্থেই তিনি বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক হিউমাররসের শিল্পী।

**উল্লেখসূচি:**


১) 'কবিজীবনী', রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পৃ. ৬৮৮-৬৮৯।

২) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ—ভূমিকা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ—কবিত্ব, বঙ্কিম রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ৭৭ এ, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৯১৯।

৩) 'বঙ্গভাষার লেখক', হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত-প্রথমভাগ, পৃ. ৮৫৬। উদ্ধৃত: 'বাংলা উপন্যাসে তির্যক দৃষ্টি', অর্ধেন্দু বিশ্বাস, গ্রন্থবিকাশ সংস্করণ, জুলাই ২০০২, বামা পুস্তকালয়, ১১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২৩৫।

৪) সাহিত্য-সাধক-চরিত-মালা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩/১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা- ৬, চতুর্থ সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৬৩, পৃ. ৯।

৫) তদেব, পৃ. ৯।

৬) তদেব পৃ. ১০-১১।

৭) তদেব, পৃ. ১২।

৮) তদেব, পৃ. ২০।

৯) 'বাংলা উপন্যাসে তির্যক দৃষ্টি', অর্ধেন্দু বিশ্বাস, গ্রন্থবিকাশ, সংস্করণ, জুলাই ২০০২, বামা পুস্তকালয়, ১১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২৪০।

১০) 'ভূত ও মানুষ', ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

১১) তদেব, পৃ. ২৪৪।

১২) তদেব, পৃ. ২৪৫।

১৩) বাংলার লেখক ও কবি, প্রমথনাথ বিশী, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, মাঘ ১৩৮৮, পৃ. ১৯-২০।

১৪) বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ, তপোধীর ভট্টাচার্য, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২

রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, প্রথম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৯৫।

১৫) বাংলা ছোটগল্প, শিশিরকুমার দাশ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ.১৩৬।

১৬) ক. 'কঙ্কাবতী' ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।
খ. 'লুল্লু', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

১৭) 'লুল্লু', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

১৮) 'লুল্লু', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

১৯) 'লুল্লু', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

২০) 'লুল্লু', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

২১) 'নয়ন চাঁদের ব্যবসা', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

২২) 'নয়নচাঁদের ব্যবসা', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

২৩) 'নয়নচাঁদের ব্যবসা', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

২৪) 'নয়নচাঁদের ব্যবসা', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

২৫) 'মুক্তামালা', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

২৬) 'মুক্তামালা', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

২৭) বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, অজিত কুমার ঘোষ, বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, করুণা প্রকাশনী, ১৮-এ টেমারলেন, তৃতীয় সংস্করণ-১৯৮৯, পৃ. ৩৩৪।

২৮) ‘মুক্তামালা’, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির।

২৯) ‘ললিত ও লাবন্য’, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৩০) ‘মূল্যবান তামাক ও জ্ঞাণবান সর্প’, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পো-রেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৩১) ‘সেকালের মোহর’, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৩২) ‘বাঙ্গালার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন’, ‘বিবিধ প্রবন্ধ’, বঙ্কিম রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ৭৭ এ, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ৭০০০০৯।

৩৩) ‘সেকালের মোহর’, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমি-টেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৩৪) ‘কেন এত নিদয় হইলে’, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৩৫) ‘বেতাল ষড়বিংশতি’, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৩৬) ‘বেতাল ষড়বিংশতি’, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৩৭) ‘বেতাল ষড়বিংশতি’, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৩৮) ‘বেতাল ষড়বিংশতি’, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৩৯) ‘মদন ঘোষের বদনে হাসি’, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৪০) ‘মদন ঘোষের বদনে হাসি’, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৪১) ‘মদন ঘোষের বদনে হাসি’, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন

লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৪২) 'মদন ঘোষের বদনে হাসি', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৪৩) 'সোনা-করা-যাদুগরের গল্প', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৪৪) 'সোনা-করা-যাদুগরের গল্প', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৪৫) 'বিদ্যাধরীর অরুচী', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৪৬) 'বিদ্যাধরীর অরুচী', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৪৭) 'বিদ্যাধরীর অরুচী', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৪৮) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা-৭৩, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, পুনর্মুদ্রণ ২০০১, পৃ. ৩৯৫-৩৯৬।

৪৯) ক. বাংলা ছোটগল্প, শিশিরকুমার দাশ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কল কাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৪৬।

খ. বাংলা গল্প বিচিত্রা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, পৃ. ১৫।

৫০) ডমরুচরিত, প্রথম গল্প, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ঠিক কন্দর্প পুরুষ কি, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৫১) ডমরুচরিত, ৪র্থ গল্প, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পিং মহাশয়, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৫২) ডমরুচরিত, দ্বিতীয় গল্প, প্রথম পরিচ্ছেদ, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৫৩) ডমরুচরিত, দ্বিতীয় গল্প, প্রথম পরিচ্ছেদ, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী

কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৫৪) ডমরুচরিত, প্রথম গল্প, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৫৫) ডমরুচরিত, দ্বিতীয় গল্প, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, সুন্দরবনের অদ্ভুত জীব, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৫৬) ডমরুচরিত, সপ্তম গল্প, সপ্তম পরিচ্ছেদ, আবার এলোকেশী, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৫৭) ডমরুচরিত, পঞ্চম গল্প, প্রথম পরিচ্ছেদ, স্বদেশী কোম্পানী, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৫৮) ডমরুচরিত, প্রথম গল্প, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ঠিক কন্দর্প পুরুষ কি, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৫৯) ডমরুচরিত, দ্বিতীয় গল্প, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, সুন্দরবনের অদ্ভুত জীব, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৬০) ডমরুচরিত, পঞ্চম গল্প, প্রথম পরিচ্ছেদ, স্বদেশী কোম্পানী, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৬১) ডমরুচরিত, প্রথম গল্প, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, ডমরুধরের তপস্যা, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৬২) ডমরুচরিত, প্রথম গল্প, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ছাল-ছাড়ান বাঘ, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৬৩) ডমরুচরিত, প্রথম গল্প, সপ্তম পরিচ্ছেদ, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৬৪) ডমরুচরিত, দ্বিতীয় গল্প, অষ্টম পরিচ্ছেদ, কুম্ভীর-বিভ্রাট, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৬৫) ডমরুচরিত, দ্বিতীয় গল্প, অষ্টম পরিচ্ছেদ, কুম্ভীর-বিভ্রাট, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৬৬) ডমরুচরিত, দ্বিতীয় গল্প, অষ্টম পরিচ্ছেদ, কুম্ভীর-বিভ্রাট, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৬৭) ডমরুচরিত, দ্বিতীয় গল্প, অষ্টম পরিচ্ছেদ, কুম্ভীর-বিভ্রাট, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৬৮) ডমরুচরিত, দ্বিতীয় গল্প, অষ্টম পরিচ্ছেদ, কুম্ভীর-বিভ্রাট, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৬৯) ডমরুচরিত, দ্বিতীয় গল্প, অষ্টম পরিচ্ছেদ, কুম্ভীর-বিভ্রাট, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৭০) ডমরুচরিত, চতুর্থ গল্প, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, ...জিলেট জিলেকি সিলেমেল, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৭১) ডমরুচরিত, চতুর্থ গল্প, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, ...জিলেট জিলেকি সিলেমেল, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৭২) ডমরুচরিত, পঞ্চম গল্প, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, 'চঞ্চলার গাইগরু', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী

গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৭৩) ডমরুচরিত, পঞ্চম গল্প, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ‘চঞ্চলার গাইগরু’, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৭৪) ডমরুচরিত, পঞ্চম গল্প, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ‘চঞ্চলার গাইগরু’, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৭৫) ডমরুচরিত, পঞ্চম গল্প, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ‘চঞ্চলার গাইগরু’, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৭৬) ডমরুচরিত, পঞ্চম গল্প, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ‘চঞ্চলার গাইগরু’, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৭৭) ডমরুচরিত, পঞ্চম গল্প, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ‘চঞ্চলার গাইগরু’, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৭৮) ডমরুচরিত, পঞ্চম গল্প, প্রথম পরিচ্ছেদ, স্বদেশী কোম্পানী, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৭৯) ডমরুচরিত, পঞ্চম গল্প, প্রথম পরিচ্ছেদ, স্বদেশী কোম্পানী, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৮০) ডমরুচরিত, পঞ্চম গল্প, প্রথম পরিচ্ছেদ, স্বদেশী কোম্পানী, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৮১) ডমরুচরিত, পঞ্চম গল্প, প্রথম পরিচ্ছেদ, স্বদেশী কোম্পানী, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৮২) ডমরুচরিত, পঞ্চম গল্প, প্রথম পরিচ্ছেদ, স্বদেশী কোম্পানী, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য়

খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৮৩) ডমরুচরিত, পঞ্চম গল্প, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ভিক্ষু ডাক্তার, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৮৪) ডমরুচরিত, পঞ্চম গল্প, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ভিক্ষু ডাক্তার, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৮৫) ডমরুচরিত, পঞ্চম গল্প, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ভিক্ষু ডাক্তার, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৮৬) ডমরুচরিত, পঞ্চম গল্প, ষষ্ট পরিচ্ছেদ, ডমরুধরের বুকে প্যাঁচ, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৮৭) ডমরুচরিত, সপ্তম গল্প, প্রথম পরিচ্ছেদ, জিলেট মন্ত্র, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৮৮) 'বিদায় আরতি', দোরোখা একাদশী, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যপুস্তক থেকে সংগৃহীত ######

৮৯) সপ্তম গল্প, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ঢাক মহাশয়, ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৯০) বাংলা গল্প বিচিত্রা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, পৃ.১৮।

৯১) 'লুল্লু', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

৯২) 'লুল্লু', ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-৭০০০১২।

---